চরিত-কথা

রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত

রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত

Lives of Great men all remind us
We can make our lives sublime.

—*Longfellow.*

মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে ক'রে গমন,
হ'য়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে, স্বীয় কীর্ত্তি ধ্বজা ধ'রে,
আমরাও হব বরণীয়।

—হেমচন্দ্র

প্রকাশক—

শ্রীমোহিনীকান্ত গুপ্ত

রজনীকুটীর

২৮।১৬ নং অখিল মিস্ত্রী লেন

কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পঞ্চম সংস্করণ।

১৩২০

রজনীকান্ত গুপ্ত

জন্ম—১২৫৬ সাল (১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ) ২৯শে ভাদ্র।

জন্মস্থান—ঢাকা জেলার অন্তর্গত মত্ত গ্রাম।

মৃত্যু—১৩০৭ সাল (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ) ৩০শে জ্যৈষ্ঠ।

গ্রন্থকারের জীবনী।

১২৫৬ সালে ভাদ্রমাসের ২৯শে তারিখে মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন মত্তগ্রামে মাতুলালয়ে রজনীকান্তের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺কমলা-কান্ত গুপ্ত তেওতা গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে রজনীকান্ত সর্ব্বকনিষ্ঠ।

তেওতা গ্রামে মাইনর স্কুলে ইঁহার বিদ্যা আরম্ভ হয়। সেই বাল্য-কালে তিনি দুষ্ট জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েন, তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত জীবন রক্ষা হইয়াছিল; কিন্তু শ্রবণ-শক্তির দুর্ব্বলতা ঘটিয়াছিল। তাহার ফল তিনি চিরজীবন ভোগ করিয়াছিলেন। উচ্চ কথা না কহিলে শুনিতে পাইতেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তেওতা স্কুলে শিক্ষক থাকায় শিক্ষাবিষয়ে কিছু সুবিধা ঘটিয়াছিল। পরে মাণিকগঞ্জ এণ্ট্রান্স স্কুলে যান, সেখানেও অপর এক সহোদর শিক্ষক ছিলেন। মাণিকগঞ্জে কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় তেওতা স্কুলে আসিয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে তিনি কলিকাতা আসেন, সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের অনুগ্রহে সংস্কৃত কলেজের স্কুলে প্রবেশের সুবিধা ঘটে, এবং তাঁহার শ্রবণ-শক্তির খর্ব্বতা দেখিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার প্রতি বিশেষ যত্ন লইবার জন্য শিক্ষকদিগকে বলিয়া দেন। তিনি শিক্ষকদিগের নিকটে বসিবার জন্য পৃথক্ আসন পাইতেন। সংস্কৃত কালেজের স্কুলে থাকিয়া ইঁহার সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে, তাঁহার সাহিত্যে অনুরাগ ও বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহারের শক্তি এইরূপেই অর্জ্জিত হইয়াছিল। ইংরেজী ভাষায় গণিতাদি বিষয়ে তিনি সেরূপ ব্যুৎপত্তিলাভে সমর্থ হন নাই; এবং এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়াও ঘটিয়া উঠে নাই।

বাল্যকালে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি হয়েন।

কিছু সংস্কৃত শিক্ষার পর আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ব্যবসায় চালাইবেন, এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কৃত কালেজে তিনি এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন মাত্র।

বিদ্যালয় ত্যাগের পরবর্ত্তী কালে তিনি কিছু দিন পরলোকগত কবিরাজ ব্রজেন্দ্রনাথ কণ্ঠাভরণের নিকট আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থ যাতায়াত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা গবর্ণমেণ্টের অধীন একটী সাবডিপুটী-গিরি যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা-ব্যবসায় বা চাকরী কিছুই তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী না হওয়ায় তিনি ঐ পথে যান নাই।

এই সময় হইতেই তাঁহার বাঙ্গালা রচনার প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক ছিল ও বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনাদ্বারা যশোলাভের বাঞ্ছা ছিল। তাঁহার রচিত প্রথম পুস্তক 'জয়দেব-চরিত' বাঙ্গালা ১২৮০ সালে প্রকাশিত হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে ঐ পুস্তক লিখিয়া তিনি রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রদত্ত পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তৎপরে ১২৮২ সালে গোল্‌ডষ্টকারের পাণিনি প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া পাণিনি পুস্তক প্রকাশ করেন।

সাহিত্যচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিবেন, রজনীকান্তের এইরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে সাহিত্যচর্চ্চায় জীবিকা চলিতে পারে কি না, তাহা তখনও প্রমাণসাপেক্ষ ছিল। সে সময়ে রজনীকান্তের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না; কলিকাতার খরচ অতিকষ্টে চালাইতেন। তাঁহার সমকালে যাঁহারা তাঁহার সহিত হিন্দু-হোটেলে বাস করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া, পরবর্ত্তীকালে সমাজে মান্য-গণ্য হইয়াছেন। রজনীকান্তের কোন উপাধিলাভ ঘটিয়া উঠে নাই। শ্রবণশক্তির দৌর্ব্বল্য তাঁহার জীবিকার্জ্জন-বিষয়ে দারুণ অন্তরায় হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় ও এরূপ সময়ে সাহিত্যচর্চ্চাদ্বারা জীবন অতিবাহনের সঙ্কল্প অসাধারণ সাহসের বা দুঃসাহসের পরিচায়ক।

রজনীকান্ত সেই সাহস বা দুঃসাহস লইয়া সাহিত্যচর্চা জীবনের ব্রতস্বরূপ অবলম্বন করিলেন। সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে, এরূপ ঘটিতে পারে না। মৌখিক অনুরাগ এইরূপ দুঃসাহস জন্মাইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালীর মধ্যে এইরূপ উদাহরণ বিরল। দ্বিতীয় উদাহরণ আছে কিনা জানি না।

এই সময়ে তিনি স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির নিকট পরিচিত হন। ভূদেববাবুর অনুরোধে তিনি সামান্য পারিশ্রমিক লইয়া এডুকেশন গেজেটে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন।

রজনীকান্তের এই সময়ে প্রায় নিঃস্ব অবস্থা। তথাপি তাঁহার প্রবল সাহিত্যানুরাগ দমিত হয় নাই। এই অবস্থাতেও তিনি পাঠের জন্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিতেন। এই অবস্থাতেই সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প করেন। অর্থাভাবে ইতিহাস লিখিয়াও মুদ্রিত করিতে পারিতেন না। ১২৮৮ সালে বঙ্গবাসী সংবাদ-পত্রের প্রতিষ্ঠা হইলে, ঐ সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখকশ্রেণীর মধ্যে রজনীকান্তের নাম বাহির হয়। ঐ বৎসর পরলোকগত রেবরেণ্ড কৃষ্ণ-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এন্ট্রান্স পরীক্ষার অন্যতমপরীক্ষক নিযুক্ত হয়েন ও তৎপরবৎসর তাঁহার সঙ্কলিত সংস্কৃত-গ্রন্থ এন্ট্রান্সে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হয়। এই ঘটনার পর হইতে আর তাঁহাকে জীবিকার জন্য ক্লেশ পাইতে হয় নাই।

বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া আর্য্য-কীর্ত্তি নামে প্রকাশ করেন। উহাই তাঁহার বালকপাঠ্য প্রথম রচনা। তৎপরে তিনি বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য ও বালকগণের পাঠ্য জন্য অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। অনেকগুলি গ্রন্থ টেক্‌স্টবুক কমিটীর অনুমোদিত হইয়াছিল। কোন কোন গ্রন্থ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইত। এইরূপে স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রচারে তাঁহার যে

আর দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সাহায্যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে আর সংসার চালাইবার জন্য চিন্তা করিতে হয় নাই।

গত ২রা বৈশাখ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি চারিজন বন্ধুর সহিত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে কাশিমবাজার গিয়াছিলেন। মহারাজ মণীন্দ্র-চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নিকট বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৃহ-নির্ম্মাণের নিমিত্ত ভূমিপ্রার্থনা উদ্দেশ্য ছিল। সে সময়ে তাঁহার হাতে গোটা দুই সামান্য ব্রণ হইয়াছিল। কাশিমবাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া আরও গোটা দুই সামান্য ব্রণ হয়। পরে পিঠের উপর একটা ব্রণ হইয়া বৈশাখ মাসটা কিছু কষ্ট পান। চিকিৎসকেরা পিঠের ব্রণকে কার্ব্বঙ্কল স্থির করায়, তাঁহার মনে কিছু আশঙ্কা হয়। সেই ব্রণ ভাল হইলে, সিপাহী-যুদ্ধের শেষ ফর্ম্মা ছাপাখানায় দিয়া, জ্যৈষ্ঠমাসে পীড়িত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিবার জন্য বাড়ী যান। বাড়ীতে থাকিতে বাম হাতের তলে একটা ব্রণ হয়। সেই ব্রণ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও ক্রমে প্রাণসংহারক হইয়া উঠে। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ দারুণ পীড়ায় পীড়িত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তখন বহুমূত্র রোগের পূর্ণাবস্থা। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাত্রি দেড়টার সময় পত্নী, দুই কন্যা ও এক পুত্র রাখিয়া রজনীকান্ত পরলোকগমন করিয়াছেন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস রচনা তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। ঐ কার্য্য সম্পাদিত করিয়াই যেন তিনি আর ইহলোকে অবস্থিতি আবশ্যক বোধ করিলেন না।

রজনীকান্তের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল। তাঁহার অমায়িক ভদ্রস্বভাবে ও উদার সরল ব্যবহারে তাঁহার বন্ধুগণ মুগ্ধ ছিলেন। এমন শান্ত স্বভাবের ও সরল ব্যবহারের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল; যিনি একবার অল্পসময়ের জন্য তাঁহার স্পর্শে আসিতেন, তিনি তাঁহার অকৃত্রিম সারল্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে তাঁহার বন্ধুগণ আত্মীয় বিয়োগের ব্যথা পাইয়াছেন। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিত; যেখানে তিনি উপস্থিত

থাকিতেন, সে স্থানকে আনন্দময় করিয়া তুলিতেন সকল সময় সাহিত্যের আলোচনায় ও সদালাপে অতিবাহিত করিতেন। বঙ্গ-সাহিত্যে রজনীকান্তের অভাব তদপেক্ষা ক্ষমতাশালী পণ্ডিতজন কর্ত্তৃক পূর্ণ হইবে ; কিন্তু সেই অকপট, শ্রদ্ধাশীল, অমায়িক, অনুরক্ত, সদানন্দ বন্ধুর অকালমরণে তাঁহার বন্ধুসমাজ যে অভাব বোধ করিবেন, তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হওয়া অবধি রজনীকান্ত গুপ্ত উহার অনুগত সেবক ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের আশ্রয়ে যখন Bengal Academy of Literature বিজাতীয় বেশ ত্যাগ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রূপান্তরিত হয়, রজনীকান্ত তদবধি উহার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তিনিই প্রথম সম্পাদক। প্রথম দুই বৎসর তিনি দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনা ও প্রবন্ধ সংগ্রহ হইতে মুদ্রণকার্য্যের তত্ত্বাবধান ও প্রুফ দেখা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই তাঁহাকে একাকী সম্পন্ন করিতে হইত। এইজন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইত। পরিষদের প্রতিষ্ঠার ও উন্নতির জন্যও তিনি প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বোধ করি, আর কোন সদস্যের নিকট সাহিত্য-পরিষদ এতটা ঋণী নহেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর ও তদানীন্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় রজনীবাবুর পরামর্শ না লইয়া পরিষদের জন্য কোন কাজই করিতেন না। পরিষদের কার্য্যপ্রণালীর আলোচনায় তিনি প্রচুর সময়ক্ষেপ করিতেন। পরিষদের উদ্দেশ্য কিরূপ হওয়া উচিত, পরিষৎ-পত্রিকার আলোচনার বিষয় কিরূপ হওয়া উচিত, এই সকল বিষয় লইয়া সর্ব্বদাই আন্দোলন করিতেন। আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষণ ছিল ; যে কাজে তিনি হাত দিতেন, শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত তাহা সম্পাদন করিতেন। মুখ্যতঃ খ্যাতিলাভের

প্ররোচনায় তিনি কোন কাজ করিতেন না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার শ্রদ্ধার ও অনুরাগের আস্পদ হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষৎ যে যে প্রধান কার্য্যে এ পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, রজনীকান্ত সেই সকল কার্য্যেই প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাবে পরিষদে পরিভাষা-সমিতি ও ব্যাকরণসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশদ্বারা বঙ্গসাহিত্যকে পরিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে পরিষদে গ্রন্থরচনা-সমিতি স্থাপনার প্রস্তাব করেন। তাঁহারই প্রস্তাবে সাহিত্যপরিষৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালাভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা প্রবেশ করাইবার জন্য চেষ্টা করেন। পরিষদের প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সর্ব্বাংশে গৃহীত হয় নাই; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ষ্ট আর্টস্ ও বি. এ. পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষা প্রচলিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা প্রণয়নের পর হইতেই রজনীকান্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বাঙ্গালারচনা বিষয়ে অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছিলেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্থসাহায্য করিবার জন্য পরিষৎ কর্ত্তৃক ও পরিষদের বাহিরে যে চেষ্টা হয়, রজনীবাবু তাহাতে আন্তরিক উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এই চেষ্টার আংশিক সফলতা তাঁহার নিরতিশয় আনন্দের কারণ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরবর্ত্তী রবিবারের সাধারণ অধিবেশনে সাহিত্যপরিষৎ তাঁহার অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। ১৭ই আষাঢ় তারিখে এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়; উহার কার্য্যবিবরণ যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে।

যে কোন সৎকার্য্যে সাধ্যমত সাহায্য করিতে পাইলে, তাঁহার যথেষ্ট আনন্দ হইত। তিনি কোনরূপ সঙ্কীর্ণভাব বা গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতেন না। ভিন্নমতাবলম্বীকে তিনি শ্রদ্ধা করিতে পারিতেন।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে রজনীকান্তের স্থান কোথায়, তাহার নির্ণয়ের এ সময় নহে। স্বাধীন ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস

আলোচনায় তিনিই পথপ্রদর্শক, তৎপূর্ব্বে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামদাস সেন প্রভৃতি ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের স্বাধীন আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন; রজনীকান্তের প্রথম গ্রন্থ জয়দেবচরিত ও পাণিনি দেখিলে মনে হয়, তাঁহারও বোধ করি সেই পুরাতত্ত্ব আলোচনার দিকেই প্রথমতঃ প্রবৃত্তি ছিল, কিন্তু শীঘ্রই তিনি সে পথ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মুসলমান ও ইংরাজ অধিকারে ভারতবর্ষের অবস্থা তাঁহার পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক গ্রন্থমাত্রেরই বিষয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য রজনীকান্ত যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার মূলে একটা কথা পাওয়া যায়;—স্বজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ। এই অনুরাগই প্রথমতঃ তাঁহাকে পুরাতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। এই অনুরাগই তাঁহাকে পরে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের স্বাধীন সমালোচনায় প্রবৃত্ত করে। ঐতিহাসিকের হস্তে স্বজাতির চরিত্রে অযথা কলঙ্কলেপন দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন। সেই কলঙ্ক প্রক্ষালনের জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিবার জন্য এই কারণে তাঁহার সঙ্কল্প হয়। আধুনিক ইতিহাসের সমগ্র ভাগ হইতে সিপাহীযুদ্ধের অংশ নির্ব্বাচন করিয়া লওয়ায়, তাঁহার মনে আন্তরিকতার আবেগের কতক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাধীনভাবে ইতিহাস আলোচনার পথ নিতান্ত সরল পথ নহে। প্রথমতঃ ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য বৈদেশিক লেখকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আপন দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা বা স্মরণে রাখা আমাদের স্বভাব নহে। সিপাহীযুদ্ধের মত নিতান্ত আধুনিক ঘটনা সম্বন্ধেও এদেশের লোক কোন কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য বোধ করে নাই। তৎকালবর্ত্তী প্রাচীন লোক যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদের স্মৃতিশক্তির উপর

কোন ঐতিহাসিক সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন নাই। ইংরাজীতে এই একটা ঘটনা লইয়া এত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে যে, তাহাতে একটা লাই-ব্রেরী হয়। রজনীকান্ত তাঁহার উৎকৃষ্ট লাইব্রেরীতে বৈদেশিকের লিখিত এই সমস্ত গ্রন্থই প্রায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বদেশীয়ের নিকট তিনি কোন সাহায্যই পান নাই। রজনীকান্ত যাঁহাদের রচিত ইতিহাসের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথার উপরেই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ তিনি যে বিষয়ের আলোচনায় হাত দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ বর্ত্তমান সময়ে দুঃসাহসের কাজ। ঝাঁসীর রাণী, কুমার সিংহ ও নানা সাহেবের সম্বন্ধে তিনি কথা কহিতে সাহস করিয়াছিলেন। তিনি কেমন নির্ভীকভাবে কথা কহিয়া-ছিলেন, তাহা তাঁহার পাঠকবর্গ অবগত আছেন। তিনি তাঁহার বন্ধুগণ কর্ত্তৃক ও তাঁহার পরিচিত উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক তাঁহার মনের আবেগ সংযত করিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু কেহ তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। দরিদ্র বাঙ্গালা-গ্রন্থজীবী গৃহস্থের পক্ষে ইহা সামান্য কথা নহে। জাতীয় ভাবের রক্ষণ ও পরিপুষ্টি রজনীকান্তের মূলমন্ত্র ছিল। দুর্ব্বলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমাদের আত্মসম্মান রক্ষার অন্য উপায় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের স্বজাতির মধ্যে, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, আমাদের পদস্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আত্মসম্মান বুদ্ধির নিতান্ত অসদ্ভাব। রজনীকান্ত যেমন একদিকে আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ককালিমা প্রক্ষালিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অন্যদিকে আমাদের প্রাচীনকালের মহা-পুরুষগণের চরিত্রের চিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া, স্বজাতীয় গৌরব খ্যাপনের সহিত জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা করিয়া, আপনাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতে শিখাইতেছিলেন। তাঁহার আর্য্যকীর্ত্তি, ভারতকাহিনী, প্রবন্ধমঞ্জরী প্রভৃতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ঐ উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল।

বিদ্যালয়স্থিত বালকগণের মনে ও জনসাধারণের মনে এই স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও অনুরাগ উদ্রেক করিবার চেষ্টা রজনীকান্তের পূর্ব্বে আর কেহই করেন নাই। 'আমাদের জাতীয়ভাব', 'আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়', 'হিন্দুর আশ্রম চতুষ্টয়', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়া তিনি সাধারণসভায় যে সকল প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছিলেন, জাতীয়ভাবের ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের উদ্দীপনাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনিই এস্থলে অগ্রণী ও পথপ্রদর্শক।

রজনীকান্তের প্রদর্শিত পথে আজকাল অনেকেই চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বৈদেশিকের বর্ণিত স্বদেশের কাহিনী বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করা উচিত নহে, এইরূপ একটা ভাব আমাদের স্বদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে। কতিপয় কৃতবিদ্য লোক ইংরাজ ইতিহাসলেখকগণের রচনার স্বাধীন আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। রজনীকান্তের পন্থানুবর্ত্তীর আজ কাল অভাব নাই; কিন্তু একটা বিষয়ে এখনও রজনীকান্ত অদ্বিতীয় রহিয়াছেন। ইহা রজনী-কান্তের ভাষা। তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তিনি যে ওজস্বিনী ভাষার অবতারণা করিয়াছিলেন, তেমন ভাষায় কথা কহিতে অপরে সমর্থ হন নাই। তাঁহার ভাষা ও তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি সাধারণের নিকটে প্রতি-পত্তির অন্যতম কারণ। উপরে যে আন্তরিকতা ও সহৃদয়তাকে তাঁহার বিশিষ্ট গুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সেই আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা হইতে এই ভাষা উৎপন্ন। তাঁহার মনের আবেগ, বর্ণিত বিষয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সেই ভাষায় স্বভাবতঃ প্রকাশ পাইত; তাঁহার মর্ম্ম হইতে সেই ভাষা বহির্গত হইয়া পাঠকের মর্ম্মে গিয়া প্রতিহত হইত। ভাষার বিশুদ্ধির দিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম পালন করা উচিত কি না, এ বিষয়ে তাঁহার মত সম্পূর্ণ উদার ও অসংকীর্ণ ছিল; তিনি সংস্কৃত

ব্যাকরণের সর্ব্বতোভাবে অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না, অথচ তিনি স্বয়ং যেরূপ মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহা বাঙ্গালা লেখকগণের মধ্যে দুই একজন ব্যতীত আর কেহ করিয়াছেন কিনা জানি না। কিন্তু বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য এই প্রয়াস তাঁহার রচনাকে কখনও কৃত্রিমতাদুষ্ট করে নাই। তাঁহার আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা তাঁহাকে এই দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ভাষাকে তিনি কেবলমাত্র ভাবপ্রকাশের উপায়স্বরূপ মনে করিতেন না। এই কারণে তাঁহার রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সাহিত্যের শরীর পোষণ করিবে; সাহিত্য-মধ্যে উহারা আসন লাভ করিবে। সে স্থান কত উচ্চে, তাহা নির্ণয়ের কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান দরিদ্র অবস্থায় বাঙ্গালায় লিখিত অন্য কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থের বা ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সম্বন্ধে এতটুকু বলা যাইতে পারে কিনা সন্দেহস্থল।

বঙ্গসাহিত্যের সেবা রজনীকান্তের জীবনের মুখ্যতম ব্রত ছিল, তিনি আপন ক্ষমতানুসারে সেই ব্রত যথাসাধ্য পালন করিয়াছেন; এবং সেই ব্রতের পালনেই আপনার সমগ্রশক্তি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। জীবনে তিনি আর কোন কাজ করেন নাই। তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী লেখক বঙ্গদেশে অনেক জন্মিয়াছেন; বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহাদের স্থান অনেক উচ্চে অবস্থিত; তাঁহাদের কার্য্যের সহিত তৎকৃত কার্য্যের তুলনায় কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু একমাত্র বঙ্গসাহিত্যের সুতরাং বঙ্গমাতার সেবাব্রতে সমগ্র জীবন উদ্‌যাপনের উদাহরণ অধিক আছে কি না, জানি না। এই অনুরক্ত সন্তানের অকালমরণে দরিদ্রা বঙ্গমাতা সন্তাপিত হইবেন, তাহাতে সংশয় নাই।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩০৭

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা বিদ্যা ও সদাচারের সাহায্যে, অধ্যবসায়ের প্রভাবে এবং বদান্যতা ও পরোপকার-গুণে পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, স্বদেশের ও বিদেশের এমন ছয় জনের জীবন-বৃত্তান্ত ইহাতে লিখিত হইয়াছে। আশা করি, এই চরিত্র পাঠে পাঠকদের ন্যায় পাঠিকারাও অনেক উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।

কতিপয় পুস্তক ও সাময়িক পত্র প্রভৃতি হইতে উপস্থিত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। ৺ প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত গ্রন্থ হইতে রামকমল সেনের বিবরণ এবং উমাচরণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত গ্রন্থ হইতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কোন কোন বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রামমোহন রায়ের জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থ এই পুস্তক লিখিত রামমোহন রায়ের জীবন-চরিতের প্রধান অবলম্বন। স্থল-বিশেষে ঐ গ্রন্থের ভাব অবিকল গ্রহণ করিয়াছি। এস্থলে ঐ সমস্ত গ্রন্থকারগণের নিকট যথোচিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

পূর্ব্বে গ্রন্থের নাম নবচরিত রাখা হইয়াছিল, পরিশেষে বন্ধু বিশেষের প্রস্তাবে উহা কেবল "চরিত-কথা" নামে প্রকাশিত হইল।
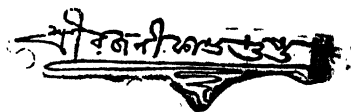
সূচীপত্র

চরিত-কথা।

স্বদেশহিতৈষী, প্রকৃত সংস্কারক

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

যখন ভারতে মুসলমানদিগের প্রতাপ তিরোহিত হয়, ইংরেজের আধিপত্য যখন ভারতের নানা স্থানে বদ্ধমূল হইতে থাকে, প্রথম গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ যখন ইংরেজ কোম্পানির অধিকৃত জনপদের শাসনকার্য্যে ব্যাপৃত হন, তখন বাঙ্গলায় একটি মহামনস্বী মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। ইনি বাল্যকালে নানা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, নানা শাস্ত্রপাঠে ভূয়োদর্শিতা সংগ্রহ করিয়া, এবং নানা স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক নানা সম্প্রদায়ের সহিত আলাপ করিয়া, জ্ঞানের গভীরতায়, দূরদর্শিতার মহিমায় ও সৎকার্য্যের গুরুতায় সমগ্র ভারতে অদ্বিতীয় লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। এই অদ্বিতীয় মহাপুরুষের নাম রামমোহন রায়।

যখন মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ মুর্শিদাবাদের নবাবসরকারে কার্য্য করিয়া, "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণচন্দ্র মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতি শাঁকাসা গ্রামে বাস করিতেন।

রামমোহন রায়

জন্ম—খৃঃ ১৭৭৪ অব্দ।

মৃত্যু—খৃঃ ১৮৩৩ অব্দ, ২৭শে সেপ্টেম্বর।

জন্মস্থান—হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রাম।

ঘটনাক্রমে তিনি শাঁকাসা গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র, অমরচন্দ্র, হরিপ্রসাদ ও ব্রজবিনোদ। কনিষ্ঠ ব্রজবিনোদ, নবাব সিরাজউদ্দৌলার আধিপত্যকালে মুর্শিদাবাদে কোন প্রধান রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শেষে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় বাসগ্রাম রাধানগরে আসিয়া জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করেন। ব্রজবিনোদ যেরূপ সম্পত্তিশালী, সেইরূপ দেবভক্ত ও পরোপকারী ছিলেন। দেবসেবায় ও পরোপকারে তিনি আপনার উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন।

ব্রজবিনোদ রায় নানাবিধ সৎকার্য্য করিয়া ক্রমে জীবনের শেষ দশায় উপনীত হইলেন। কথিত আছে, তিনি অন্তিমকালে গঙ্গাতীরস্থ হইয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী চাতরা গ্রামনিবাসী শ্যাম ভট্টাচার্য্য নামক একটি ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থী হইয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন। আসন্নমৃত্যু ব্রজবিনোদ ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন শ্যাম ভট্টাচার্য্য ব্রজবিনোদের কোন একটি পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবার প্রার্থনা জানাইলেন। ব্রজবিনোদ রায় পরম বৈষ্ণব ছিলেন। এদিকে শ্যাম ভট্টাচার্য্য প্রগাঢ় শাক্ত, সুতরাং তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে ব্রজবিনোদের সহজেই অসম্মতি হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দেবভক্ত ব্রজবিনোদ রায় অন্তিমকালে ভাগীরথীতীরে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তিনি শ্যাম ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, সুতরাং কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ না করিয়া, আপনার পুত্রগণের প্রত্যেককে অভ্যাগত ব্রাহ্মণের দুহিতা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার সাত পুত্রের মধ্যে ছয় জন পিতার ঐ অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন। পরিশেষে, পঞ্চম পুত্র রামকান্ত রায় ব্রাহ্মণের সহিত

পিতৃসত্যপালনে প্রতিশ্রুত হইলেন। অবিলম্বে পরম বৈষ্ণব ব্রজবিনোদ রায়ের পুত্র রামকান্তের সহিত শক্তিমতাবলম্বী শ্যাম ভট্টাচার্য্যের দুহিতা ফুলঠাকুরাণীর পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইল। এই রামকান্ত ও ফুলঠাকুরাণী মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জনক ও জননী। খ্রীঃ ১৭৭৪ অব্দে পিতৃনিবাসভূমি রাধানগর গ্রামে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। রামমোহন ব্যতীত জগন্মোহন নামে রামকান্তের আর একটি পুত্রসন্তান ছিল। রামমোহনের একটি বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নাম রামলোচন। জগন্মোহন ও রামলোচন উভয়েই রামমোহনের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

রামমোহনের মাতা ফুলঠাকুরাণী স্বামীগৃহে আসিয়া বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব সাতিশয় পবিত্র ও ধর্ম্মনিষ্ঠা সাতিশয় বলবতী ছিল। সদ্‌গুণে, সদাচরণে ও সৎকার্য্যসম্পাদনে তিনি রমণীকুলের বরণীয়া ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ, দেবসেবার জন্য স্বার্থত্যাগ ও সর্ব্বপ্রকার কষ্টসহিষ্ণুতা এরূপ ছিল যে, তিনি শেষাবস্থায় যখন জগন্নাথদর্শনে যাত্রা করেন, তখন সঙ্গে একটি দাসীও লইয়া যান নাই, দুঃখিনীর ন্যায় পদব্রজে বহুদূরবর্ত্তী শ্রীক্ষেত্রে উপনীত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে এক বৎসরকাল তিনি প্রত্যহ সম্মার্জ্জনী দ্বারা জগন্নাথদেবের মন্দির পরিষ্কৃত করিতেন। জননীর এইরূপ অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠায় রামমোহনের হৃদয় অসাধারণ ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। মাতার সৎকার্য্যে ও সাধু দৃষ্টান্তেই রামমোহনের ভাবী সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়।

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা হওয়ার পর রামমোহনের মাতার বৈষ্ণবধর্ম্মে কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল, তৎসম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। একদা ফুলঠাকুরাণী কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনকে সঙ্গে লইয়া পিতৃগৃহে গিয়াছিলেন। এই সময়ে একদিন শ্যাম ভট্টাচার্য্য ইষ্টদেবতার পূজা

করিয়া রামমোহনের হস্তে দেবতার নির্ম্মাল্য বিল্বদল সমর্পণ করেন। ফুলঠাকুরাণী আসিয়া দেখিলেন, রামমোহন সেই বিল্বপত্র চর্ব্বণ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া ফুলঠাকুরাণীর বড় ক্রোধ হইল। তিনি পিতাকে তিরস্কার করিতে করিতে পুত্রের মুখ হইতে বিল্বপত্র ফেলিয়া তাহার মুখ ধৌত করিয়া দিলেন। দুহিতার তিরস্কারে ও পবিত্র নির্ম্মাল্যের অবমাননায় শ্যাম ভট্টাচার্য্যের ক্রোধের আবির্ভাব হইল। ক্রোধের আবেগে ভট্টাচার্য্য কন্যাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন যে, "তুই যেরূপ অবজ্ঞার সহিত আমার পূজার পবিত্র বিল্বপত্র ফেলিয়া দিলি, সেইরূপ তোর শাস্তি হইবে। তুই কখনও এই পুত্র লইয়া সুখী হইতে পারিবি না, কালে এই পুত্র বিধর্ম্মী হইবে।" পিতার মুখে এই ঘোরতর অভিশাপবাক্য শুনিয়া ফুলঠাকুরাণী বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন। শাপমোচনের জন্য কাতরভাবে পিতার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি সস্নেহে ফুলঠাকুরাণীকে কহিলেন "আমি যাহা কহিলাম, তাহা কখনও নিষ্ফল হইবে না, তবে তোমার এই পুত্র রাজপূজ্য ও অসাধারণ লোক হইবে।" কথিত আছে ফুলঠাকুরাণী শ্বশুরালয়ে যাইয়া স্বামীকে পিতৃশাপের বিষয় কহেন। রামকান্ত ও ফুলঠাকুরাণী উভয়েই উহাতে বিশ্বাস করিয়া আপনাদের চিরাচরিত ধর্ম্ম-পদ্ধতিতে পুত্রকে আস্থাবান্ করিবার জন্য যত্ন করিতে থাকেন। তাঁহাদের এই প্রয়াস প্রথমে বিফল হয় নাই। অল্প বয়সেই বৈষ্ণবধর্ম্মে রামমোহনের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। আপনাদের দেবতা রাধাগোবিন্দ বিগ্রহের প্রতি তিনি যারপরনাই ভক্তি দেখাইতেন এবং যারপরনাই ভক্তিসহকারে আপনাদের ধর্ম্মসম্মত ক্রিয়াকাণ্ড নির্ব্বাহ করিতেন। কথিত আছে, তিনি ভাগবতের এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। রামকান্ত ও ফুলঠাকুরাণী তনয়ের এইরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কৌলিক ক্রিয়ায় আস্থা দেখিয়া প্রীত

হইলেন। পুত্র যে কালে আপনবংশের ধর্ম্মপদ্ধতি পরিত্যাগ করিবে, এ দুশ্চিন্তা তাঁহাদের মনে উদিত হইল না।

রামমোহন প্রথমে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার স্মৃতিশক্তির সহিত অসাধারণ বুদ্ধির সংযোগ থাকাতে তিনি অল্প আয়াসে ও অল্প সময়েই অনেক বিষয় শিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে পারসী ও আরবী ভাষাতেই প্রায় সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। সুতরাং ঐ দুই ভাষা আয়ত্ত করা শিক্ষার্থীদিগের প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। রামমোহন পিতৃগৃহে পারস্য ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। শেষে পিতা তাঁহাকে পারসী ও আরবীতে ব্যুৎপন্ন করিবার জন্য পাটনায় পাঠাইয়া দেন। এই সময়ে রামমোহনের বয়স বার বৎসর। রামমোহন দ্বাদশবর্ষবয়সে পাটনায় যাইয়া আরবী শিখিতে প্রবৃত্ত হন, এবং তিন বৎসর কাল তথায় অবস্থিতি করিয়া ইউক্লিডের জ্যামিতি ও কোরাণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান আরবী গ্রন্থ অধ্যয়ন পূর্ব্বক উক্ত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

ইহার পর রামকান্ত পুত্রকে সংস্কৃত শিখাইবার জন্য কাশীতে পাঠাইয়া দেন। রামমোহন কাশীতে উপস্থিত হইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে বেদাদি গ্রন্থ তাঁহার আয়ত্ত হইল। প্রগাঢ় বুদ্ধি ও অসীম স্মৃতিশক্তিতে তিনি প্রাচীন আর্য্যঋষিদিগের নিরূপিত ব্রহ্মজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করিলেন। রামমোহন অল্প বয়সের মধ্যে এইরূপে শাস্ত্রপারদর্শী হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। এই সময় হইতে তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে নানা চিন্তা করিতেন। প্রচলিত ধর্ম্মপদ্ধতির সম্বন্ধে তাঁহার মনে গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হইত। শিক্ষা তাঁহার অন্তঃকরণ প্রশস্ত করিয়াছিল, তিনি আরবী ভাষায় মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, মৌলবীদিগের সহিত আলাপ করিয়া মুসলমানধর্ম্মের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া-

ছিলেন, কাশীতে যাইয়া বেদাদিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। এখন মুসলমান-শাস্ত্রের একেশ্বরবাদে ও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁহার পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তিনি ক্রমে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধ-বাদী হইয়া উঠিলেন; রামকান্ত ও ফুলঠাকুরাণী পুত্রকে ভিন্নপথবর্ত্তী হইতে দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। পিতা রামমোহনকে অনেক বুঝাই-লেন, কিন্তু তাহাতে রামমোহনের মত পরিবর্ত্তিত হইল না। পিতা পুত্রে মধ্যে মধ্যে তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল। এই সময়ে রামমোহনের বয়স ষোল বৎসর। রামমোহন এই বয়সেই "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক-ধর্ম্মপ্রণালী" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে পৌত্তলিক-তার বিরুদ্ধে অনেক কথা লিখিত হয়। পুত্রের এইরূপ ব্যবহারে রামকান্তের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। রামকান্ত পুত্রের উপর বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। বিরাগের আবেগে তাঁহার ক্রোধ প্রবল হইল। রামমোহন গৃহ হইতে নিষ্কাশিত হইলেন।

রামমোহন ষোল বৎসর বয়সে গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া, ভারত-বর্ষের নানাস্থান পরিভ্রমণে উদ্যত হইলেন। তিনি বিভিন্ন প্রদেশের ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িবার জন্য নানা ভাষা শিখিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পথ সুগম হইল। তিনি ক্রমে হিমালয় অতিক্রম পূর্ব্বক তিব্বত দেশে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে বিদেশে ভ্রমণের কোন সুবিধা ছিল না। নানা স্থানে দস্যুতস্করের প্রাদুর্ভাব ছিল। বাষ্পীয় শকট বা বাষ্পীয়যান কিছুই প্রচলিত ছিল না। বাঙ্গালী তখন বিদেশ ভ্রমণের নামে চমকিত হইয়া উঠিত। এই দুঃসময়ে বাঙ্গালার একটি ষোড়শবর্ষীয় যুবক বিপদাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষ পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক সুদূরবর্ত্তী তিব্বতে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

রামমোহন রায় ৩ বৎসর তিব্বতে বাস করেন। ঐ সময়ের মধ্যে

তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিব্বতবাসিগণ জীবিত মনুষ্যবিশেষকে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করে। এই মনুষ্যের উপাধি "লামা"। রামমোহন তিব্বতবাসীদিগের ঐ মতের বিরুদ্ধে অনেক তর্কবিতর্ক করেন। বিদেশে বন্ধুহীন হইয়াও তিনি অকুতোভয়ে উহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে নিরস্ত থাকেন নাই। তিব্বতবাসিগণ আপনাদের ধর্ম্মসম্মত কার্য্যের প্রতিবাদ জন্য সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রামমোহনকে সমুচিত শাস্তি দিতে উদ্যত হইত। রামমোহন কেবল তিব্বতে কোমলহৃদয়া কামিনীগণের স্নেহে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা পাইতেন। এই আত্মীয়স্বজন-শূন্য দূরতর দেশে কেবল নারীজাতিই তাঁহার সুখ ও শান্তির অদ্বিতীয় অবলম্বনস্বরূপ ছিল। রাজা রামমোহন রায় এজন্য আজীবন নারীজাতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিব্বতবাসিনী দয়াশীলা রমণীগণ তাঁহার কোমল হৃদয়ে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির বীজ রোপণ করিয়া দেয়, বয়োবৃদ্ধির সহিত সেই বীজ হইতে অনেক মহৎ ফলের উৎপত্তি হয়। রামমোহন নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি দেখাইতে কখনও বিরত থাকেন নাই। তিনি স্বদেশে, বিদেশে, স্বপ্রণীত গ্রন্থে বা বন্ধুজনসন্নিধানে সর্ব্বত্রই নারীচরিত্রের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেন।

রামমোহন তিব্বত হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হইলেন। রামকান্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সন্তানবাৎসল্যে একেবারে জলাঞ্জলি দিতে পারেন নাই। এখন রামমোহনের জন্য তাঁহার হৃদয় অধীর হইল। তিনি রামমোহনকে গৃহে আনিবার জন্য উত্তরপশ্চিম প্রদেশে একজন লোক পাঠাইলেন। প্রেরিত লোকের সঙ্গে রামমোহন বিংশতি বর্ষ বয়সে আবালবাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। রামকান্ত রায় অপরিসীম আনন্দের সহিত পুত্ররত্নকে গ্রহণ করিলেন। ফুলঠাকুরাণী অপরিসীম স্নেহ ও

আদরের সহিত পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

গৃহে আসিয়া রামমোহন রায় বিশেষ মনোযোগের সহিত সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা করিতে লাগিলেন। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতিতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি জন্মিল। এ সময়েও পিতাপুত্রে মধ্যে মধ্যে তর্কবিতর্ক হইত। রামকান্ত ভাবিয়াছিলেন যে, কয়েক বৎসর কাল বিদেশে বহুকষ্টে থাকাতে পুত্রের সমুচিত শিক্ষা হইয়াছে। সুতরাং পুত্র এখন বাগ্‌বিতণ্ডা নিষ্পত্তি না করিয়া আপনাদের কৌলিক ধর্ম্মপালনে ও সাংসারিক কার্য্যসম্পাদনে মনোনিবেশ করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা দূর হইল। রামমোহন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সাহসের সহিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। রামকান্ত আর এই দুর্ব্বিনীত ব্যবহার সহ্য করিতে পারিলেন না। পুত্রকে পুনর্ব্বার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তিনি পুত্রকে এইরূপে গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিলেও কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন।

খ্রীঃ ১৮০৪ অব্দে রামকান্ত রায়ের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। কথিত আছে, মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে রামকান্ত রায় আপনার সমুদয় সম্পত্তি তিন পুত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন রায় পিতার মৃত্যুর পর অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করেন নাই। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধবাদী হওয়াতে তাঁহার জননী তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া সম্পত্তিচ্যুত করিবার জন্য কলিকাতা "সুপ্রিমকোর্ট" নামক বিচারালয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় ঐ মোকদ্দমায় জয়ী হন। তিনি আপনাকে বিধর্ম্মী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার বিপক্ষগণও আদালতে তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন নাই। রামমোহন রায় এক সময়ে স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, "আমি কখনও হিন্দু-

ধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম্ম এক্ষণে প্রচলিত আছে, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল।

কথিত আছে যে, রামমোহন যদিও পিতৃসম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারী ছিলেন, তথাপি আত্মীয়স্বজনের মনে কষ্ট দিয়া উহা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে নিরস্ত হন। সমস্ত সম্পত্তিই তাঁহার মাতা ফুলঠাকুরাণীর অধীনে থাকে। ফুলঠাকুরাণী জমীদারীসংক্রান্ত কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতেন। যাহা হউক, রামমোহন পিতার মৃত্যুর পর পুনর্ব্বার গৃহে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এ সময়েও তাঁহার পাঠানুরাগ পূর্ব্ববৎ ছিল। এরূপ গল্প আছে যে, একদা তিনি প্রাতঃস্নান করিয়া, একটি নির্জ্জন গৃহে বসিয়া বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত সংস্কৃত রামায়ণ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলেন। রামমোহনের পিতামহ ও পিতা নবাব সরকারে চাকরী করিয়াছিলেন। যে সকল বিষয়ে শিক্ষিত হইলে ঐ সকল চাকরী পাওয়া যাইত, রামকান্ত রামমোহনকে তদ্বিষয় শিক্ষা দিতে ক্রটি করেন নাই। এ সময়ে পারস্য ভাষাই অধিকতর চলিত ছিল, এজন্য রামমোহন ঐ ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি বাইশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ইংরেজী শিখেন নাই। বাইশ বৎসর বয়সে ইংরেজি শিখিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী আরও পাঁচ ছয় বৎসর তিনি উহাতে মনোযোগ দেন নাই। সুতরাং ২৭।২৮ বৎসর বয়সে তিনি ইংরেজি ভাষায় মনোগত ভাব সামান্যরূপে প্রকাশ করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু ভাল করিয়া ইংরেজি লিখিতে জানিতেন না।

রামমোহন রায় এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি রঙ্গপুরের কলেক্টর জন ডিগ্‌বি সাহেবের নিকটে কেরাণীগিরির প্রার্থী হইলেন। তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। রামমোহন কর্ম্মগ্রহণের পূর্ব্বে সাহেবের নিকটে প্রস্তাব করিলেন যে, যখন তিনি কার্য্যের জন্য

সাহেবের সম্মুখে আসিবেন, তখন তাঁহাকে আসন দিতে হইবে। আর সামান্য আমলাদিগের প্রতি যেরূপ হুকুমজারি করা হয়, তাঁহার প্রতি সেরূপ করা হইবে না। ডিগবি সাহেব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, রামমোহন রায় কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। রামমোহন কিরূপ স্বাধীন-প্রকৃতি ছিলেন, চরিত্রগুণ তাঁহাকে কিরূপ উন্নত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা এই বিবরণে প্রকাশ পাইতেছে।

রামমোহন রায় যেরূপ যত্ন ও উৎসাহের সহিত আপনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, তাহাতে ডিগ্‌বি সাহেবের মনে বড় আহ্লাদের সঞ্চার হইল। এই সময়ে দেওয়ানী (জজের ও কলেক্টরের সেরেস্তাদারী তখন "দেওয়ানী" বলিয়া অভিহিত হইত) আমাদের পক্ষে উচ্চপদ বলিয়া পরিগণিত ছিল। রামমোহন স্বীয় দক্ষতা ও বিদ্যাবুদ্ধির বলে ক্রমে ঐ উন্নত পদে নিযুক্ত হইলেন। রামমোহনের অসাধারণ গুণের পরিচয় পাইয়া ডিগ্‌বি সাহেব তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মিল। মৃত্যুপর্য্যন্ত ঐ বন্ধুতার বিচ্ছেদ হয় নাই।

চিরপ্রচলিত ধর্ম্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে রামমোহনের অনেক শত্রু হইয়াছিল। অনেকে তাঁহার বাড়ীতে নানাপ্রকার উপদ্রব করিত। কিন্তু রামমোহন অসাধারণ ধীরতার সহিত সমস্ত সহ্য করিতেন। তিনি কখনও কোনরূপ প্রতিহিংসায় উদ্যত হন নাই। ক্রমে ঐ সকল উৎপাত আপনাআপনি থামিয়া যায়। রামমোহনের তিন বিবাহ। তাঁহার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর, তদীয় পিতা, এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় আর একটি কুমারীর সহিত তাঁহাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদের বিবাহ সময়ে হিন্দু-সমাজে বড় আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু আন্দোলন-কারিগণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। হুগলী জেলার একজন

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যার সহিত যথাবিধানে রাধাপ্রসাদের পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হয়।

আপনাদের বংশ বহুবিস্তৃত হওয়াতে রামকান্ত রায় রাধানগর হইতে সপরিবারে লাঙ্গুড়পাড়া গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। যাহা হউক, রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যতই তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মাতার ক্রোধ বাড়িতে লাগিল। ক্রমে ফুলঠাকুরাণী রামমোহনের দুই স্ত্রী ও তাঁহার নব পুত্রবধূকে লাঙ্গুড়পাড়ার বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। রামমোহন এই জন্য লাঙ্গুড়পাড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক উহার নিকটবর্ত্তী রঘুনাথপুরে একটি বাটী প্রস্তুত করেন। তিনি সময়ে সময়ে ঐ বাটীতে যাইয়া বাস করিতেন।

রঙ্গপুরের কর্ম্ম পরিত্যাগের পর রামমোহন কিছু দিন মুর্শিদাবাদে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। এই খানে তিনি পারস্য ভাষায় "তোহাফ্-তুল মোহদিন্" (সকল জাতীয় লোকের পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ) নামক একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা আরবী ভাষায় লিখিত হয়। এই গ্রন্থের জন্য বহুসংখ্যক লোক তাঁহার শত্রু হইয়া উঠে।

মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দে ৪০ বৎসর বয়সে রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃত হইল। তিনি এই বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অকুতোভয়ে, অবিচলিত সাহসসহকারে, জীবনের মহত্তর ব্রত সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, রাজনীতির সংস্কার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহার সমান দক্ষতা, সমান একাগ্রতা ও সমান শ্রমশীলতা পরিস্ফুট হইতে লাগিল। যে মহৎকার্য্যের জন্য রামমোহন রায় আজ পর্য্যন্ত সমস্ত সভ্যজগতের বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, এই সময়

হইতেই সেই কার্য্যের সূচনা হয়। তিনি আপনার অর্থ ও জীবন সমস্তই সেই কার্য্যের জন্য উৎসর্গ করেন।

রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিলে কলিকাতার কতিপয় প্রধান ব্যক্তি তাঁহার সহিত সর্ব্বদা আলাপ করিতে লাগিলেন। এই আলাপে অনেকে তাঁহার প্রগাঢ় ধর্ম্মজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি আমাদের দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং প্রসিদ্ধ ডেবিড্ হেয়ার ও পাদরী আডাম্ সাহেব প্রভৃতি সকলেই তাঁহার নিকটে সর্ব্বদা আসিতেন। রামমোহন প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদক গ্রন্থ সকল নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণও পুস্তক প্রচার করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষ সমর্থনে উদ্যত হইলেন। রামমোহন আবার আপত্তিকারিগণের যুক্তি খণ্ডন করিয়া নূতন পুস্তক প্রচার করিতে লাগিলেন। যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের পরিশুদ্ধ মতসকল সংগৃহীত হয়, এবং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই সত্যের বিমল আলোক বিকাশ পায়, তৎপ্রতি রামমোহনের বিশেষ যত্ন ছিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মুর্শিদাবাদে অবস্থিতিকালে রামমোহন পারস্য ভাষায় একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের মধ্যে কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ ও সত্য প্রচারই ঐ গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রামমোহন রায় এক্ষণে খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদপাঠে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি মূল গ্রন্থ পড়িবার জন্য হিব্রু ভাষা শিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অল্প সময়ের মধ্যে ঐ ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া "বাইবেল" হইতে খ্রীষ্টের উপদেশ সঙ্কলন পূর্ব্বক একখানি গ্রন্থ প্রচার করিলেন। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, হিব্রুর সহিত আরবীর অতি নিকট সম্বন্ধ। রামমোহন আরবীতে সুপণ্ডিত

ছিলেন, এ জন্য মুসলমানেরা তাঁহাকে মৌলবী বলিত। আরবীতে ব্যুৎপত্তি থাকাতে রামমোহন অতি অল্প আয়াসেই হিব্রু ভাষা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রামমোহন হিব্রু ভাষায় খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ পড়িয়া খ্রীষ্টের উপদেশগুলি মাত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত ধর্মগ্রন্থে খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের যে বিবরণ আছে, স্বীয় গ্রন্থে তৎসমুদয়ের কোন উল্লেখ করেন নাই। এ জন্য অনেক গোঁড়া পাদরী তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠিলেন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধবাদী হওয়াতে রামমোহন পূর্ব্বেই হিন্দুদিগের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, এখন অনেক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকও তাঁহার বিপক্ষ হইলেন। কিন্তু ইহাতে উদারস্বভাব রামমোহনের কিছুমাত্র দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হয় নাই। নিরাশা বা হতাশ্বাস কখনও তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি ধীর ও প্রশান্তভাবে আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন, এবং অটল পর্ব্বতের ন্যায় অটল ভাবে থাকিয়া বিপক্ষসম্প্রদায়ের কঠোর আক্রমণে বাধা দিতে লাগিলেন।

খ্রীঃ ১৮১৫ অব্দে রামমোহন আপনার কলিকাতাস্থিত বাসভবনে "আত্মীয়সভা" নামে একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তাহে একদিন মাত্র ঐ সভার অধিবেশন হইত। ঐ সভায় বেদপাঠ ও ব্রহ্মসঙ্গীত হইত। এই সময়ে রামমোহন রায়ের কয়েকজন সহচর লোকের নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। যাঁহারা নিয়মিতরূপে আত্মীয়সভায় উপস্থিত হইতেন, লোকে নাস্তিক বলিয়া তাঁহাদের প্রতিও নানা প্রকার কটূক্তি করিত। এইরূপ নানা বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতেও রামমোহন কখন অধীর হন নাই, তিনি প্রতিদিন সায়ংকালে প্রশান্তভাবে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। আত্মীয়সভা স্থাপনের কিছুকাল পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে বিষয়ী

বলিয়া পৈতৃক বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। রামমোহন ইহাতে এরূপ বিব্রত হইয়াছিলেন যে, দুই বৎসর কাল আত্মীয়সভার অধিবেশন হয় নাই। ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার জন্য একটি সভা স্থাপন করিতে রামমোহনের অনেক দিন হইতে ইচ্ছা ছিল। রামমোহন এখন ইচ্ছা পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইলেন। খ্রীঃ ১৮২৮ অব্দে কমললোচন বসুর * বাটীতে উপাসনাসভা স্থাপিত হইল। ঐ সভা স্থাপনের কিছুদিন পরেই অনেক অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। ঐ অর্থে এখন চিৎপুর রোডের পার্শ্বে বর্ত্তমান ব্রাহ্ম সমাজ গৃহ নির্ম্মিত হইল। খ্রীঃ ১৮২ অব্দের ১১ই মাঘ হইতে ঐ নবনির্ম্মিত গৃহে সমাজের কার্য্য হইতে লাগিল। এই জন্য প্রতি বৎসর ১২ই মাঘ ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে।

রামমোহনের জ্যেষ্ঠ সহোদর জগন্মোহনের পরলোকপ্রাপ্তি হইলে, তাঁহার স্ত্রী সহমৃতা হন। রামমোহন স্বয়ং এই সহমরণের ভীষণ দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। ঐ ভীষণ দৃশ্যে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হয়। উহা তাঁহার মনে এরূপ দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে তিনি কখনও ঐ শোচনীয় কাণ্ড ভুলিয়া যান নাই। যেরূপেই হউক, হিন্দুসমাজ হইতে ঐ কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ করিতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। সতীদিগকে যেরূপ বলপূর্ব্বক মৃত পতির সহিত এক চিতায় দগ্ধ করা হইত, যাহাতে তাহারা চিতা হইতে উঠিতে না পারে, এজন্য যেরূপ বলপূর্ব্বক তাহাদের বুকে বাঁশ চাপাইয়া দেওয়া হইত, যাহাতে তাহাদের মর্ম্মভেদী ভীষণ আর্ত্তনাদ লোকের শ্রুতিপ্রবিষ্ট না হয়, এ জন্য যেরূপ মহাশব্দে নানাবিধ বাদ্য বাদিত হইত, তাহা রামমোহনের অবিদিত ছিল না।

---

* কমললোচন বসু পর্ত্তুগীজ বণিকদিগের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। এ জন্য লোকে তাঁহাকে ফিরিঙ্গী কমলবসু বলিত।

রামমোহন এই ভীষণ প্রথা উচ্ছেদের জন্য তিনখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সহমরণ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্যই যে শ্রেষ্ঠ, তাহা তিনি অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা ঐ সকল গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

সতীদাহের বিরুদ্ধে রামমোহনকে এইরূপ বদ্ধপরিকর দেখিয়া প্রাচীন মতাবলম্বী হিন্দুগণ যারপরনাই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। এ সম্বন্ধে রামমোহনের সঙ্গে তাঁহাদের ঘোরতর তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল। কিন্তু রামমোহন তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইলেন না। তিনি সময়ে সময়ে ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইয়া মৃতপতিক রমণীর সহমরণ নিবারণের অনেক চেষ্টা করিতেন। কথিত আছে, কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া একটি মহিলা সহমৃতা হইবার জন্য ভাগীরথীতীরে উপনীতা হন। রামমোহন এই সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং সেই মহিলাকে সহমরণ হইতে নিবৃত্ত রাখিবার জন্য তাঁহার আত্মীয়দিগকে শান্তভাবে বুঝাইতে লাগিলেন। এক ব্যক্তি ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া কহিলেন, "হিন্দুর কার্য্যে মুসলমান কেন?" এই অপমানবাক্যেও রামমোহন রায় ক্রুদ্ধ হইলেন না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় শান্তভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে যে ভৃত্য ছিল, প্রভুর প্রতি অসম্মান প্রদর্শিত হওয়াতে তাহার বড় ক্রোধ হইয়াছিল, কিন্তু রামমোহন রায় তাহাকে স্থির থাকিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

এই সময়ে লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। কথিত আছে, একদা গবর্ণর জেনেরল সতীদাহের সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহাকে আপনার প্রাসাদে আনিতে আপনার একজন সৈনিক কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দেন। উক্ত কর্ম্মচারী রামমোহন রায়ের নিকট উপস্থিত হইলে, রামমোহন তাঁহাকে কহিলেন, "আমি এক্ষণে বৈষয়িক কার্য্য হইতে অপসৃত হইয়া

শাস্ত্রানুশীলনে নিযুক্ত রহিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক লাট সাহেবকে জানাইবেন যে, আমার রাজদরবারে উপস্থিত হইতে বড় ইচ্ছা নাই।” কর্ম্মচারী যাহা শুনিলেন, লর্ড বেণ্টিঙ্কের নিকটে যাইয়া অবিকল তাহাই বলিলেন। গবর্ণর জেনেরল তাঁহাকে কহিলেন, “আপনি রামমোহন রায়কে কি বলিয়াছিলেন?” তিনি উত্তর করিলেন, “আমি কহিয়াছিলাম, আপনি গবর্ণর জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিলে তিনি বাধিত হন।” গবর্ণর জেনেরলের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। তিনি গম্ভীরভাবে পারিষদকে কহিলেন, “আপনি আবার তাঁহার নিকটে যাইয়া বলুন যে আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেবের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিলে, তিনি বড় বাধিত হন।” উক্ত সৈনিককর্ম্মচারী আবার রামমোহন রায়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া বিনয়ের সহিত ঐ কথা বলিলেন। ভারতের গবর্ণর জেনেরলের এইরূপ শিষ্টাচারে রামমোহন রায় যারপরনাই প্রীত হইলেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া গবর্ণর জেনেরলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সতীদাহ সম্বন্ধে আপনার উদার মত তাঁহাকে জানাইলেন। “মণিকাঞ্চন যোগ” হইল। গবর্ণর জেনেরল সতীদাহ প্রথার অনিষ্ট-কারিতা বুঝিয়া ১৮২৯ অব্দে ঐ কুপ্রথা রহিত করিয়া দিলেন। রামমোহনের কীর্ত্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইল। পবিত্র ইতিহাস হইতে এ কীর্ত্তির কথা কখনও বিচ্যুত হইবে না।

সতীদাহ প্রথা উঠিয়া যাওয়াতে প্রাচীন মতাবলম্বী হিন্দুগণ অধিক-তর ক্রুদ্ধ হইলেন। চারিদিক হইতে রামমোহনের উপর গালিবর্ষণ হইতে লাগিল। কলিকাতার কোন কোন ধনী লোক তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইতে লাগিলেন। রামমোহন রায় ইহাতে শঙ্কিত হইয়া আপনার পবিত্র কর্ত্তব্যপথ হইতে অণুমাত্র বিচলিত হন নাই। তাঁহার হিতৈষী বন্ধুগণ তাঁহাকে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে কহিতেন,

এবং বাহিরে যাইতে হইলে প্রহরী সঙ্গে লইয়া যাইতে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু রামমোহন কখনও প্রহরী সঙ্গে লইতেন না। বাহিরে যাইবার সময়ে তিনি বক্ষঃস্থলে পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে একখানি কীরিচ রাখিয়া নির্ভয়ে রাজপথে একাকী ভ্রমণ করিতেন।

রামমোহন রায়ের সময়ে ইংরেজী ও পাশ্চাত্য জ্ঞানপ্রচারের কোনও সুবিধা ছিল না। রাজপুরুষদিগের এক পক্ষের মত ছিল যে, ভারতবর্ষীয়দিগকে ইংরেজী শিক্ষা না দিয়া সংস্কৃত ও পারসী শিক্ষা দেওয়াই উচিত। কিন্তু অপর পক্ষ ইংরেজী শিক্ষা দেওয়াই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছিলেন। রামমোহন এই শেষোক্ত দলের পরিপোষক হইলেন। ইংরেজী শিক্ষা না করিলে যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-লাভ ও নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে না, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি ইংরেজী শিক্ষার সমর্থন করিয়া খ্রীঃ ১৮২৩ অব্দে তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল লর্ড আমহার্ষ্টকে এক খানি পত্র লিখেন। পত্রখানি ইংরেজিতে লিখিত হয়। ঐ পত্রে ইংরেজীশিক্ষার উপকারিতা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছিল। উক্ত পত্র এরূপ অকাট্য যুক্তিপূর্ণ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত ছিল যে, তৎ-কালীন সুবিজ্ঞ ইংরেজেরা উহা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ঐ পত্র পড়িয়া অনেকে রামমোহন রায়ের ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞতার বিস্তর প্রশংসা করেন। যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন, শেষে তাঁহাদেরই জয়লাভ হয়। ইংরেজী শিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগ হইতে থাকে। ইহাতে রামমোহন রায় যারপরনাই আহ্লাদিত হন। যে ইংরেজী শিক্ষার গুণে আমাদের এরূপ উন্নতি হইয়াছে, ডেবিড্ হেয়ার প্রভৃতি ইংরেজ ও রামমোহন রায়ই তাহার বীজ রোপণ করেন।

উপস্থিত সময়ে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের অবস্থা বড় মন্দ ছিল।

রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে যে কয়েকখানি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ভাষা এরূপ অপকৃষ্ট ছিল যে, সাধারণে তাহা পড়িতে ইচ্ছা করিত না। রামমোহন রায়ই বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের উন্নতির পথ প্রদর্শন করেন। তিনি ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অপরাপর বিষয়েও তিনি কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাষা বিশুদ্ধ ও সরল ছিল। তিনি "গৌড়ীয় ব্যাকরণ" নামে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। তৎকর্ত্তৃক "সম্বাদকৌমুদী" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি সকল বিষয়ই প্রকাশিত হইত। রামমোহন রায় এতদ্ব্যতীত একখানি ভূগোল ও একখানি খগোল লিখিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় যে, ঐ পুস্তকদ্বয় এখন আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ব্রহ্মসঙ্গীত রচনায় রামমোহন রায়ের অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার গীতগুলি এরূপ সুললিত, এরূপ গভীর ভাবপূর্ণ ও এরূপ ঐশ্বরিক তত্ত্বের বিকাশক যে, এক্ষণে তৎসমুদয় আমাদের জাতীয় সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অনেকেই রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসঙ্গীত আদরসহকারে শুনিয়া থাকেন। তাঁহার সঙ্গীতে অনেক পাষণ্ডের হৃদয়ও আর্দ্র হয় এবং অনেক সংসার-বিষয়-নিমগ্ন ব্যক্তির মনও উদাসীন করিয়া তুলে।

রামমোহন রায় রাজনীতির আন্দোলনেও নিরস্ত ছিলেন না। তিনি আমাদের দেশে মুদ্রণস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে অনেক যত্ন করেন। এ জন্য অনেক উচ্চপদস্থ ইংরেজ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইলেও তিনি জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য ঐ কার্যে বিরত হন নাই। এতদ্ব্যতীত রামমোহন রায় গবর্ণমেণ্টের অনেক কঠোর আইনের প্রতিকূলেও দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

ইউরোপ দেখিতে রাজা রামমোহন রায়ের বড় ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বহুদিন সুযোগ অভাবে সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর সম্রাট্‌কে কয়েক বিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে সম্রাট ইংলণ্ডে আবেদন করিবার জন্য রামমোহন রায়কে পাঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হন। রামমোহন রায় এখন সম্রাটের বিষয় ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিবার জন্য বিলাতযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। বিলাত-যাত্রার দিন তিনি তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য এত লোক হইয়াছিল যে, গৃহের সোপান-শ্রেণীতে দাঁড়াইবার অণুমাত্র স্থান ছিল না। রামমোহন রায় সকলের নিকট বিদায় লইয়া খ্রীঃ ১৮৩০ অব্দে ১৫ই নবেম্বর সমুদ্রপোতে আরোহণ করিলেন। জাহাজে রামমোহন রায় নিজের কামরায় আহার করিতেন। রন্ধনের জন্য স্বতন্ত্র স্থান না থাকাতে প্রথমে বড় অসুবিধা হইয়াছিল। একটিমাত্র মৃণ্ময় চুল্লীতে পাক হইত। তাঁহার ভৃত্যেরা সমুদ্রপীড়ায় কাতর হইয়া তাঁহার কামরায় শয়ন করিয়া থাকিত। তিনি এমন সদয় প্রকৃতি ছিলেন যে, ভৃত্যদিগকে আপনার কামরা হইতে কখনও অন্তর্হিত করিতে ইচ্ছা করিতেন না; নিজে অন্য স্থানে অতি কষ্টে শয়ন করিয়া থাকিতেন। জাহাজের যাত্রিগণের সকলেই রামমোহনের উদার প্রকৃতি ও সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া এরূপ প্রীত হইয়াছিল যে, কেহই তাঁহার সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করিত না। সকলেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে ব্যগ্র থাকিত। ঝটিকা উপস্থিত হইলে তিনি জাহাজের উপর দাঁড়াইয়া স্থিরভাবে প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য ও সুদূর-প্রসারিত শুভ্রফেণমালা-শোভিত সুনীল সাগরের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া জগৎপতি পরমেশ্বরের গুণগান করিতেন।

প্রায় ৫৩ দিনে জাহাজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইল। রামমোহন রায় প্রথমে লিবরপুল নগরে উপস্থিত হইলেন। বিলাতের অনেক

প্রধান প্রধান বিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। অনেকের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার বাদানুবাদ হইতে লাগিল। ইংলণ্ডের জ্ঞানিগণ তাঁহার বিচারনৈপুণ্য, তাঁহার বাক্পটুতা, তাঁহার উদার ভাব ও তাঁহার জ্ঞান-গরিমায় এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডের তদানীন্তন-সর্ব্বপ্রধান জ্ঞানী বেন্থাম সাহেব তাঁহাকে মানবজাতির হিত-সাধন ব্রতে তাঁহার শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় সহযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

রামমোহন রায় লিবরপুল, লণ্ডন ও মানচেষ্টার নগরে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। তিনি ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর সম্বন্ধে পার্লিয়া-মেণ্ট মহাসভার নিয়োজিত সমিতির সমক্ষে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের অধিপতি তাঁহাকে আদরসহকারে গ্রহণ করেন এবং একটি প্রকাশ্য ভোজে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার সম্মান বর্দ্ধিত করিয়া তুলেন। রামমোহন ইংলণ্ড হইতে খ্রীঃ ১৮৩২ অব্দের শরৎকালে ফরাসী দেশ দর্শন করিতে যাত্রা করেন। ফ্রান্সের তদানীন্তন সম্রাট্ তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তিনি রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করি-তেও সঙ্কুচিত হন নাই। ফ্রান্সের অনেক রাজপুরুষ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি রামমোহন রায়ের অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিতে বিস্মিত হইয়া তাঁহার সমুচিত সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় পরবর্ত্তী বৎসর ইংলণ্ডে উপনীত হইয়া, ব্রিষ্টল নগরে একটি উদ্যান পরিবেষ্টিত সুন্দর নগরে আসিয়া বাস করেন। এইখানে ব্রিষ্টলের পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত ভারতবর্ষের রাজনীতি ও ধর্ম্ম-নীতির সম্বন্ধে তাঁহার অনেক আলাপ হয়। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে যে সকল কঠিন প্রশ্ন করেন, রামমোহন রায় ও ঘণ্টাকাল সমভাবে দণ্ডায়-মান থাকিয়া তৎসমুদয়ের সদুত্তর দিয়াছিলেন। ইহাই রামমোহনের

পবিত্র জীবনের শেষ ঘটনা। ইহার পরেই রামমোহন ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হন।

খৃঃ ১৮৩৩ অব্দের ১৯এ সেপ্টেম্বর রামমোহন রায়ের জ্বর হইল। ঐ জ্বরের বিরাম না হইয়া ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে বিকার উপস্থিত হইল। প্রধান প্রধান চিকিৎসকেরা যত্নের সহিত তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। ভারতহিতৈষী ডেবিড্ হেয়ারের কন্যা দিবারাত্রি তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। ২৭এ সেপ্টেম্বর শুক্রবার জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে সকল শেষ হইল। দুই ঘণ্টা পনর মিনিটের সময়ে ভারতের প্রধান পুরুষ, জ্ঞানের প্রধান উপদেষ্টা, বহুদূরদেশে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার মৃত শরীরে যজ্ঞোপবীত ছিল। সেই উদ্যানপরিবেষ্টিত স্থানের একটি নির্জ্জন বৃক্ষবাটিকায় তাঁহাকে সমাহিত করা হইল।

রামমোহন রায় দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে ‘রাজা’ উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি সম্রাটের যে কার্য্যের জন্য বিলাতে গিয়াছিলেন, কর্ত্তৃপক্ষের বিচার-দোষে সে কার্য্য সিদ্ধ হয় নাই। যাহা হউক, দূরদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাঁহার অসাধারণ গুণের কখনও অবমাননা করেন নাই। তিনি যে স্থানে গিয়াছেন, সেই স্থানেই তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান ও আদর প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার যেরূপ মানসিক ক্ষমতা সেইরূপ শারীরিক বল ছিল। দুঃখীদিগের প্রতি তাঁহার যথোচিত সমবেদনা ছিল। একদা তিনি চোগা চাপকান পরিয়া পদব্রজে কলিকাতার রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন যে একজন তরকারীওয়ালা তাহার বোঝা নামাইয়া আর উহা তুলিতে পারিতেছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার মোটটি মাথায় তুলিয়া দিলেন। আর একদিন রামমোহন রায় কলিকাতার মুটিয়াদের অবস্থা জানিবার

জন্য কোন 'মুটিয়ার সহিত বসিয়া আগ্রহসহকারে আলাপ করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় কোমলমতি বালকদিগের সহিত আমোদ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার বাটীতে একটি দোলনা ছিল। বালকেরা ঐ দোলনায় বসিলে তিনি স্বয়ং তাহাদিগকে দোলাইতেন, পরে 'এখন আমার পালা' বলিয়া নিজে দোলনায় বসিতেন। বালকেরা উল্লাসের সহিত তাঁহাকে দোলাইত। তাঁহার বাবরী চুল ছিল। তিনি প্রতিদিন স্নান করিয়া, দর্পণ সম্মুখে রাখিয়া অনেকক্ষণ কেশবিন্যাস করিতেন।

রামমোহন রায় অধিক ভোজন করিতে পারিতেন। তাঁহার ভোজনের সম্বন্ধে অনেকগুলি গল্প প্রচলিত আছে। ঐ সকল গল্পে জানা যায় যে, তিনি একাকী একটি ছাগের সমুদয় মাংস ভোজন ও সমস্ত দিনে বার সের দুগ্ধ পান করিতে পারিতেন। একদা পঞ্চাশটি আম্র দিয়া জলযোগ করিয়াছিলেন। আর এক সময়ে তিনি একটি সুপরিচিত লোকের বাসায় গিয়া প্রায় এক কাঁদি নারিকেল ভক্ষণ করেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, রামমোহনের মাতা তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে তিনি রঘুনাথপুর গ্রামে বাটী নির্ম্মাণ করেন। এই বাটীতে তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের জন্ম হয়। মাতৃকর্ত্তৃক তাড়িত হইলেও রামমোহন মাতার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। কিছুকাল ফুলঠাকুরাণী পুত্রের মহত্ব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন, এবং জগন্মোহন, রামলোচন ও রামমোহনের পুত্রদিগের মধ্যে জমীদারী ভাগ করিয়া দিয়া, স্বয়ং জগন্নাথদর্শনে গমন করেন।

অসাধারণ সহিষ্ণুতা, অসাধারণ উদারতা ও অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাবে রামমোহন রায় সমস্ত সভ্যজনপদবাসীর বরণীয় হইয়া রহিয়া-

ছেন। তিনি সমগ্র জগতের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার অসামান্য জ্ঞানা-
লোকে অনেকের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে। যতদিন সাধুত্ব
ও জ্ঞানের সম্মান থাকিবে, ততদিন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের
নাম কখনও বিলুপ্ত হইবে না।

স্বশক্তি-সমুত্থিত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

হুগলী জেলায় ত্রিবেণী নামে একখানি গ্রাম আছে। গ্রামখানি
হুগলী ও চুঁচুড়ার নিকটবর্ত্তী। পবিত্র-সলিলা ভাগীরথী উহার পাদ-
দেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। গ্রামে রুদ্রদেব তর্কবাগীশ নামে
একজন ব্রাহ্মণ অধ্যাপক বাস করিতেন। তিনি সঙ্গতিপন্ন ছিলেন
না; ক্রিয়াকাণ্ডের নিমন্ত্রণ ও শিষ্য যজমান হইতে যাহা লব্ধ হইত,
তাহা দ্বারা অতি কষ্টে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন।
দরিদ্রতাহেতু রুদ্রদেবের অনেক সাংসারিক কষ্ট উপস্থিত হইত, কিন্তু
তিনি সহিষ্ণুতা-গুণে সমুদয় সহ্য করিতেন। তাঁহার হৃদয় কোনরূপ
দুর্ঘটনায় অধীর হইত না, এবং তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধিও কোনরূপ দুশ্চিন্তায়
অবসন্ন হইয়া পড়িত না। তিনি সকল সময় ধীরভাবে আপনার কার্য্য
করিতেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে রুদ্রদেবের পারদর্শিতা ছিল। অনেক
ছাত্র তাঁহার নিকট [illegible] গ্রহণ করিত; তিনি ইহাদিগকে পুত্রের সহিত

শিক্ষা দিতেন। নানারূপ সাংসারিক কষ্ট পাইয়াও, তিনি শাস্ত্রচর্চায় কখনও অবহেলা করিতেন না। শাস্ত্রানুশীলন তাঁহার একটি প্রধান আমোদ ছিল। তিনি কয়েকখানি সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের টীকা প্রস্তুত করেন। এইরূপে অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও গ্রন্থ-প্রণয়নে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত।

কিন্তু দরিদ্রতা অপেক্ষা একটি ঘোরতর দুর্ঘটনা রুদ্রদেবের সাতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠিল। তিনি স্ত্রীপুত্রে পরিবৃত হইয়া নিজের সহিষ্ণুতা-গুণে যে শান্তি-সুখ ভোগ করিতেছিলেন, ঐ দুর্ঘটনায় সে সুখ বিলুপ্ত হইল। রুদ্রদেবের বয়স প্রায় চৌষট্টি বৎসর, এই সময়ে তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র উভয়েরই মৃত্যু হয়। বৃদ্ধদশায় এইরূপ গুরুতর শোক পাইয়া, রুদ্রদেব সংসার পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইলেন। পুণ্য-ভূমি বারাণসীতে যাইয়া ঈশ্বরচিন্তায় জীবিত কালের অবশিষ্টভাগ অতি-বাহিত করা এক্ষণে তাঁহার একমাত্র সঙ্কল্প হইল। চন্দ্রশেখর বাচস্পতি নামে তাঁহার একজন সুহৃৎ জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। রুদ্রদেব একান্ত নির্ব্বিঘ্ন হৃদয়ে কাশীবাস করিবার উদ্দেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,

"বাচস্পতি! আমার ত সংসারের সমস্ত সুখ শেষ হইল, এখন গণনা করিয়া দেখ, আমার কাশীপ্রাপ্তির কোন বিঘ্ন হইবে কি না?"

চন্দ্রশেখর শোক-সন্তপ্ত রুদ্রদেবের কথায় সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁহার বিষাদ তিরোহিত হইল। তিনি স্বীয় অদ্ভুত জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভাবে গণনা করিয়া হর্ষোৎফুল্ললোচনে কহিলেন,

"তর্কবাগীশ! শোক পরিত্যাগ কর; তোমার সংসারের সুখ আজিও শেষ হয় নাই। তুমি কাশীবাস করিও না; কয়েক বৎসরের মধ্যেই তোমার একটি দিগ্বিজয়ী পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে, এবং তোমার বিস্তীর্ণ বংশ বহুকাল থাকিবে।"

বৃদ্ধ রুদ্রদেব ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,

"মূর্খ! জ্যোতির্ব্বিদ্যায় তোমার অদ্ভুত পারদর্শিতার পরিচয় পাইলাম। মৃত-পত্নীক বৃদ্ধ দরিদ্র ব্যক্তির পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? তুমি অনেক নির্ব্বোধকে মুগ্ধ করিয়া প্রতিপত্তি সঞ্চয় করিয়াছ, এখন আর চাপল্য না দেখাইয়া আমার তীর্থযাত্রার শুভদিন স্থির কর।"

চন্দ্রশেখর বাচস্পতি রুদ্রদেবের কথায় কিছুমাত্র অপ্রতিভ হইলেন না, বিলক্ষণ দৃঢ়তার সহিত সগর্ব্বে উত্তর করিলেন,

"আমি যাহা কহিলাম, তাহা কখনও মিথ্যা হইবে না, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমার এই গণনা ভ্রম-পূর্ণ হইলে আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থ গঙ্গার জলে ফেলিয়া তোমার সহিত কাশীবাসী হইব।"

অদূরে ত্রিবেণী ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাচীন পণ্ডিতদ্বয়ের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। ইহাদের মধ্যে রঘুনাথপুর-নিবাসী বাসুদেব ব্রহ্মচারী নামে একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখর বাচস্পতির কথা শুনিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কহিলেন,

"মহাশয়! বিবাহের একটি দিন স্থির করুন।"

চন্দ্রশেখর কিঞ্চিৎ উন্মনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কার বিবাহ?"

বাসুদেব উত্তর করিলেন,

"আমার কন্যার।"

চন্দ্রশেখর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,

"পাত্র স্থির হইয়াছে?"

বাসুদেব গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,

"হাঁ, সৎপাত্র স্থির করিলাম।"

পরে রুদ্রদেবের দিকে অঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া কহিলেন,

"আপনার সম্মুখেই পাত্র উপস্থিত। আমি এই শাস্ত্রজ্ঞ বিশুদ্ধাচারী মহাপুরুষকেই কন্যা সম্প্রদান করিব।"

চন্দ্রশেখর নিরুত্তর হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে বিস্ময় ও সন্দেহের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। বাসুদেব তাঁহাকে বিস্মিত ও সন্দিহান দেখিয়া পুনর্ব্বার গম্ভীরভাবে কহিলেন,

"মহাশয়! আমার কথায় সন্দেহ বা বিস্ময় প্রকাশ করিবেন না। আমি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী, কখনও মিথ্যাবাদী হইয়া পাপ সঞ্চয় করি নাই। আমরা তর্কবাগীশ মহাশয়ের পিতার শিষ্য। ধর্ম্মতঃ কহিতেছি, আমি গুরুপুত্রকেই স্বীয় দুহিতা সম্প্রদান করিব। আপনি নিঃসন্দিগ্ধ-চিত্তে বিবাহের একটি শুভদিন স্থির করুন।"

চন্দ্রশেখরের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। বৃদ্ধ রুদ্রদেব ভবিতব্যতার নিকট মস্তক অবনত করিলেন। তিনি আর কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। এদিকে চন্দ্রশেখর হৃষ্টচিত্তে বিবাহের দিন স্থির করিলেন। বাসুদেব ঐ শুভদিনে আপনার বাসগ্রাম রঘুনাথপুরে আত্মীয় স্বজনদিগকে আহ্বান করিয়া যথাবিধানে রুদ্রদেবের হস্তে স্বীয় দুহিতা অম্বিকাকে সমর্পণ করিলেন। চন্দ্রশেখরের গণনার একাংশ সিদ্ধ হইল। রুদ্রদেব নবপরিণীতা বনিতার সহিত ত্রিবেণীতে প্রত্যাগত হইলেন।

কিন্তু রুদ্রদেবের উৎকণ্ঠা দূর হইল না। বিবাহের কিছু দিন পরেই তিনি কাশীতে যাইয়া সন্তান কামনায় বিশ্বেশ্বর দেবের আরাধনা করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। অম্বিকা সাত্তিশয় পতিপরায়ণা ও প্রিয়ভাষিণী ছিলেন। জরাজীর্ণ পতির প্রতি তিনি কখনও অনাদর বা অনাদর দেখান নাই। রুদ্রদেব তর্কবাগীশ সেবনায় ঐরূপ

আরগ্য লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে পুনর্ব্বার সংসারধর্ম্মে মনোনিবেশ করি-লেন। অনতিবিলম্বে রুদ্রদেবের বাসনা ফলবতী হইল। ১১০১ সালে (খ্রীঃ ১৬৯৪ অব্দে) পৈতৃক বাসভূমি ত্রিবেণী গ্রামে তাঁহার একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। এই সময়ে রুদ্রদেবের বয়ঃক্রম ছয়ষট্টি বৎসর হইয়াছিল। রুদ্রদেব তনয়লাভে হৃষ্ট হইয়া যথানিয়মে জাত-কর্ম্মাদি সম্পাদন পূর্ব্বক জন্মরাশিনক্ষত্রানুসারে বালকের নাম "রাম রাম" রাখিলেন।

এদিকে বাসুদেব ব্রহ্মচারীও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি পুরীতে যাইয়া দুহিতার অপত্যকামনায় জগন্নাথদেবের আরাধনা করেন। যথারীতি আরাধনা শেষ করিয়া বাসুদেব নবজাত দৌহিত্রের নাম-করণের দশ দিন পরে ত্রিবেণীতে প্রত্যাগত হন। জামাতৃগৃহে আসি-য়াই দৌহিত্রের মুখ সন্দর্শনে বাসুদেবের অপরিসীম আহ্লাদের সঞ্চার হইল। জগন্নাথের প্রসাদে দৌহিত্রলাভ হইল বলিয়া, বাসুদেব বালকের নাম জগন্নাথ রাখিলেন। রুদ্রদেব-তনয় অতঃপর এই জগন্নাথ নামেই প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল।

শেষ দশায় পুত্র-সন্তানের মুখ দেখিয়া রুদ্রদেব অপরিসীম সন্তোষ লাভ করিলেন। পুত্রের সন্তুষ্টি সাধনই একণে তাঁহার একমাত্র কার্য্য হইয়া উঠিল। জগন্নাথ পিতা মাতার সাতিশয় আদর ও স্নেহের পাত্র হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু এইরূপ অতি আদরে তাঁহার স্বভাব বিকৃত হইল। বাল্যকালে জগন্নাথ দুঃশীল ও অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন। তিনি যেরূপে ইষ্টক নিক্ষেপ পূর্ব্বক পথিকদিগকে উদ্বেজিত করিতেন, কুলকামিনীদিগের কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন, গ্রামের বালকদিগকে ধরিয়া প্রহার করিতেন, অভীষ্ট বস্তু না পাইলে জননীকে যন্ত্রণা দিতেন, তাহা অদ্যাপি ত্রিবেণীর বৃদ্ধ-সম্প্রদায় কথা-প্রসঙ্গে ব্যক্ত করিয়া থাকেন। সুশীলা অম্বিকা তনয়ের দুঃশীলতার

জন্য সর্ব্বদাই পল্লীস্থ কামিনীদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। প্রতিবেশিগণ জগন্নাথের অত্যাচারে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত। জগন্নাথ ইহাতে আহ্লাদে মত্ত হইতেন। পিতা জগন্নাথকে শাসন করিতেন, জগন্নাথ তাহাতে বধির হইয়া থাকিতেন; মাতা জগন্নাথকে কোলে তুলিয়া উপদেশ দিতেন, জগন্নাথ ঈষৎ হাসিয়া তাহাতে উপেক্ষা দেখাইতেন। এইরূপ দুঃশীলতায় ও অত্যাচারে অনাশ্রব (একগুঁয়ে) বালকের সময় অতিবাহিত হইত।

রুদ্রদেব জগন্নাথকে পাঁচ বৎসর বয়সে বিদ্যাশিক্ষায় প্রবর্ত্তিত করেন; জগন্নাথ অনাবিষ্ট ছিলেন না। তাঁহার মেধা অসাধারণ ছিল, বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত ছিল এবং মনোযোগ প্রগাঢ় ছিল। তিনি পিতার নিকটেই প্রথমে মুখে মুখে ব্যাকরণ ও অভিধান শিখিয়া, পরে কয়েকখানি সাহিত্য-গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। পাঠ্য গ্রন্থগুলির সমস্তই এই পঞ্চবর্ষীয় শিশুর আয়ত্ত ছিল; পূর্ব্বে যাহা না পড়া হইয়াছে, তাহাও তিনি পঠিত পাঠের ন্যায় বলিয়া দিতে পারিতেন। একদিন কয়েকজন গ্রামবাসী জগন্নাথের অত্যাচারে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, রুদ্রদেবের নিকট অভিযোগ করিল। রুদ্রদেব পুত্রের অসদ্ব্যবহারে যারপরনাই অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাহাকে দুর্ব্বৃত্ত ও লেখাপড়ায় অনাবিষ্ট বলিয়া নানারূপ ভৎর্সনা করিতে করিতে পুস্তক আনিয়া পাঠ বলিতে কহিলেন। জগন্নাথ অপ্রতিভ হইলেন না, তিনি ধীরভাবে তাহার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। রুদ্রদেব পুত্রের এই অসাধারণ ক্ষমতা ও স্বাবলম্বন দেখিয়া, যুগপৎ বিস্মিত ও আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, জগন্নাথ কালে একজন অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিবে। রুদ্রদেবের এই বিশ্বাস অমূলক হয় নাই। কালে জগন্নাথ অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া সমস্ত সভ্য-সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

জগন্নাথের বয়স যখন আট বৎসর, তখন তাঁহার মাতার পরলোক-প্রাপ্তি হয়। এত অল্প বয়সে মাতৃহীন হওয়াতে জগন্নাথ পিতার অধিকতর আদর ও স্নেহের পাত্র হইয়া উঠেন। এই সময়ে তাঁহার এক মাতৃষসা তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করেন। মাতৃ বিয়োগ-প্রযুক্ত পিতার আত্যন্তিক স্নেহ, অষ্টবর্ষীয় শিশুর দুঃশীলতা বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ হইয়া উঠে। বংশবাটী (বাঁশবেড়িয়া) গ্রামে রুদ্রদেব তর্কবাগীশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারেরর চতুষ্পাঠী ছিল। জগন্নাথের ঔদ্ধত্যদর্শনে ভবদেব সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে আপনার চৌবাড়ীতে আনয়ন করেন। এই স্থলে জগন্নাথ সাহিত্য ও অলঙ্কার পাঠ শেষ করিয়া স্মৃতি পড়িতে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রতি দিন প্রত্যূষে বংশবাটীতে যাইয়া জ্যেষ্ঠতাতের ভবনে মধ্যাহ্ন ভোজন করিতেন। মাসী তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন, এজন্য তাঁহার অনুরোধে রাত্রিকালে তাঁহাকে ত্রিবেণীর বাটীতে আসিতে হইত। জগন্নাথ এই-রূপে প্রতিদিন ত্রিবেণী ও বংশবাটীতে যাতায়াত করিতেন। এসময়েও তাঁহার দুঃশীলতা একবারে তিরোহিত হয় নাই। একদিন তিনি ত্রিবেণী হইতে বংশবাটীতে আসিতেছিলেন, পথে দেখিতে পাইলেন প্রসিদ্ধ বিগ্রহ—পঞ্চানন ঠাকুরের সম্মুখে অনেকগুলি ছাগ বলি হইতেছে। জগন্নাথ মাংসপ্রিয়তাবশতঃ পাণ্ডার নিকটে একটি ছিন্ন ছাগ প্রার্থনা করিলেন। পাণ্ডা তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিতে অসম্মত হইল। জগন্নাথ সে সময়ে কিছু কহিলেন না, নীরবে অধ্যাপকের চতুষ্পাঠীতে আসিয়া পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে জগন্নাথ সন্ধ্যাকালে যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন, তখন গোপনে জ্যেষ্ঠতাতের গোশালা হইতে একটি বুড়ী সংগ্রহ করিয়া লইলেন, এবং গোপনে উহা লইয়া গৃহে যাইবার সময় পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দিরের সম্মুখে উপনীত হইলেন। ঐ সময়ে মন্দিরে কেহই উপস্থিত ছিল না। পাণ্ডারা সায়ংকালীন

আরতি সমাপন করিয়া আপনাদের বাসগৃহে গিয়াছিল ; সুতরাং জগন্নাথ নিঃশব্দে ও নিঃসঙ্কোচে দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন, নিঃশব্দে ও নিঃসঙ্কোচে সমস্ত অলঙ্কার-সমেত পবিত্র বিগ্রহ ঝুড়ীতে রাখিলেন এবং নিঃশব্দে ও নিঃসঙ্কোচে উহা মাথায় লইয়া, ত্রিবেণীতে আগমন পূর্ব্বক বাটীর নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর জলে ফেলিয়া দিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে পাণ্ডারা আপনাদের উপজীব্য বিগ্রহ দেখিতে না পাইয়া সাতিশয় চিন্তিত ও বিষণ্ণ হইল। তাহারা জগন্নাথের স্বভাব জানিত, সুতরাং জগন্নাথকেই অপহারক ভাবিয়া ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের টোলে আসিয়া তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ জানাইল। জগন্নাথ অদূরে উপবিষ্ট ছিলেন, ভবদেব স্নেহমধুরস্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"জগন্নাথ ! পঞ্চানন-বৃত্তান্ত কিছু অবগত আছ ?"

জগন্নাথ নিরুত্তর রহিলেন। তিনি নানারূপ অত্যাচার করিলেও কখন মিথ্যা কথা কহিতেন না ; অনেকেই তাঁহার এই সত্যবাদিতার প্রশংসা করিত। জগন্নাথ যাহাদের প্রতি অত্যাচার করিতেন, তাহারাও অনেক সময়ে তাঁহার সত্যবাদিতা ও তেজস্বিতা দেখিয়া বিস্মিত হইত। জগন্নাথ যে পঞ্চাননের দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিলেন না। জ্যেষ্ঠতাত অতঃপর কি বলেন, জানিবার জন্য নীরবে রহিলেন। ভবদেব জগন্নাথকে নিরুত্তর দেখিয়া সমুদয় বুঝিলেন; কিন্তু ক্রুদ্ধ হইয়া কোন তিরস্কার করিলেন না, পূর্ব্বের ন্যায় স্নিগ্ধস্বরে জগন্নাথকে কহিলেন,

"বিগ্রহ প্রত্যর্পণ কর। ইঁহারা তোমার সহিত আর কখনও অসদ্ব্যবহার করিবেন না।"

জগন্নাথ তেজস্বিতাসহকারে কহিলেন,

"উহারা অগ্রে মহাশয়ের পাদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রতি বৎসর আমাকে এক একটি পাঁঠা দিবার অঙ্গীকার করুক।"

পাণ্ডারা তাহাই করিল। জগন্নাথ তখন পঞ্চানন ঠাকুরকে পুষ্করিণীর যে স্থানে রাখিয়াছেন, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া পাণ্ডাদিগকে কহিলেন, “বুড়ীটি জ্যেঠা মহাশয়ের বাড়ীতে দিয়া যাইও।” পাণ্ডারা জগন্নাথের নির্দ্দেশ অনুসারে বিগ্রহ তুলিয়া লইল। এদিকে জগন্নাথের মাতৃদেবী দেবতার এই দুরবস্থার বিবরণ অবগত হইয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি জগন্নাথকে অনেক তিরস্কার করিলেন, এবং পাছে জগন্নাথের কোন অমঙ্গল হয়, এই আশঙ্কায় পঞ্চানন ঠাকুরের পূজা মানিলেন।

এইরূপ দুঃশীল হইলেও জগন্নাথ পাঠে অমনোযোগী ছিলেন না। তিনি যে শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিতেন, অসাধারণ বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ প্রতিভাবলে অল্প সময়ে ও অল্প আয়াসে তাহাই আয়ত্ত করিয়া তুলিতেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, জগন্নাথ এই সময়ে স্মৃতিশাস্ত্র পড়িতেছিলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত চন্দ্রশেখর বিদ্যাবাচস্পতির প্রণীত “দ্বৈতনির্ণয়” নামে একখানি স্মৃতিগ্রন্থ আছে। চন্দ্রশেখর বিদ্যাবাচস্পতি ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের পিতা হরিহর তর্কালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ সহোদর। একদা ভবদেব ঐ গ্রন্থখানি আপনার এক জন প্রধান ছাত্রকে পড়াইতেছিলেন। অধ্যাপনাসময়ে বহু চিন্তাতেও গ্রন্থের এক স্থলের অর্থপরিগ্রহ করিতে না পারিয়া কহিলেন,

“এই অংশ জ্যেঠা মহাশয় ভাল বুঝিতে পারেন নাই।”

নিকটে জগন্নাথ বসিয়াছিলেন, ভবদেবের কথায় ঈষৎ হাসিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে কহিলেন,

“মহাশয়ের জ্যেঠা বেশ বুঝিয়াছিলেন, আমার জ্যেঠা বুঝিতে পারিতেছেন না।”

দ্বাদশবর্ষীয় বালকের এইরূপ প্রগল্‌ভতায় ভবদেব সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইল। জগন্নাথ জ্যেষ্ঠতাতকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া কিছুমাত্র ভয় পাইলেন না, গ্রন্থের যে স্থলে অর্থসংগতি

হয় নাই, অম্লানবদনে ও বিলক্ষণ সমীচীনতাসহকারে তাহার মীমাংসা করিয়া দিলেন। ইহাতে সহজে সেই স্থলের অর্থ পরিস্ফুট হইল। ভবদেব অনেক ভাবিয়াও জগন্নাথের মীমাংসার কোন দোষ ধরিতে পারিলেন না। ইহাতে ভবদেবের আহ্লাদের অবধি রহিল না। তিনি জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিলেন। এতক্ষণে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, কালে জগন্নাথ একজন অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিবে। ভবদেব জগন্নাথের এইরূপ প্রতিভাদর্শনে যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে স্মৃতি পড়াইতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ঐ শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তিনি ধীরভাবে স্মৃতিশাস্ত্রের বিচার করিয়া আপনার অসাধারণ পাণ্ডিত্য বিকাশ করিতেন, এবং ধীরভাবে স্মৃতিঘটিত দুরূহ বিষয়গুলির বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া ব্যবস্থা দিতেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসরের অধিক হয় নাই। দ্বাদশবর্ষীয় বালককে এইরূপ একজন প্রধান স্মার্ত্ত হইতে দেখিয়া, সকলেই নিরতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১১১৬ সালে (খ্রীঃ ১৭০৯ অব্দে) জগন্নাথ পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। মেড়ে গ্রামের দ্রৌপদী নামে একটি সুলক্ষণ-সম্পন্না বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই সময়ে জগন্নাথ পঞ্চদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, জগন্নাথ জরাগ্রস্ত পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন, এইজন্য তাঁহাকে এত অল্পবয়সে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। তিনি অল্পবয়সে মাতৃহীন হন, তাঁহার পিতা জরা-জীর্ণ হইয়া ঐহিক জীবনের চরম সীমায় পদার্পণ করেন। সুতরাং শেষ দশায় পুত্রবধূর মুখ নিরীক্ষণ করিতে পিতার বলবতী ইচ্ছা জন্মে। প্রাচীন মতাবলম্বী রুদ্রদেব এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি যথানিয়মে স্নেহাস্পদ তনয়কে একটী মনোমত কুমারীর সহিত সম্মিলিত করিয়া আপনার মনোরথ সিদ্ধ করিয়াছিলেন।

অল্পবয়সে বিবাহ হইলেও জগন্নাথ বিদ্যাশিক্ষায় অমনোযোগী হন নাই। তাঁহার বিবাহের কিছুদিন পরেই ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। এজন্য জগন্নাথ স্মৃতি অধ্যয়নের পর, আপনার বাসগ্রামে আসিয়া রঘুদেব বিদ্যাবাচস্পতির টোলে ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। সংস্কৃত ভাষার ন্যায় ইহাও অতি দুরূহ ও জটিল বিষয়। তীক্ষ্ণ মনীষা-সম্পন্ন না হইলে এই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করা দুর্ঘট। কিন্তু জগন্নাথের মনীষার অভাব ছিল না, তিনি অল্পসময়েই ন্যায়শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া, একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক হইয়া উঠেন। সাধারণ নৈয়ায়িকগণের ন্যায় তাঁহার কেবল বাচালতা ও পাণ্ডিত্যাভিমান ছিল না। ঐ সকল নৈয়ায়িকদিগের বুদ্ধি আছে, কিন্তু বুদ্ধির স্থিরতা নাই, বহুশাস্ত্রে দর্শন আছে, কিন্তু কোন শাস্ত্রে প্রবেশ নাই, বিচারে প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু যুক্তিপ্রদর্শনে ক্ষমতা নাই; জগন্নাথ ঐ অহম্মুখ ও অহঙ্কারী পণ্ডিতসম্প্রদায় অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উন্নত ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধির স্থিরতা ছিল, বহুশাস্ত্রে প্রবেশ ছিল, এবং যুক্তি প্রদর্শনে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কথিত আছে, ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করার এক বৎসর পরে, তিনি নবদ্বীপের একজন প্রসিদ্ধ ন্যায়-শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতকে বিচারে পরাজিত ও সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। এই পণ্ডিতের নাম রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ। ইনি বিখ্যাত জগদীশ তর্কালঙ্কারের পৌত্র। রমাবল্লভ একদা কতিপয় শিষ্যসমভিব্যাহারে রঘুদেবের টোলে আসিয়া অতিথি হন এবং মহা দর্পে বিচার আরম্ভ করিয়া সকল ছাত্রকে অপ্রতিভ ও পরাজিত করিয়া তুলেন। সমুদয় ছাত্র পরাভূত হইল দেখিয়া, রঘুদেব অন্যায়মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক রমাবল্লভের সহিত কূট তর্ক আরম্ভ করিলেন। রমাবল্লভ ইহাতে বিরক্ত হইয়া

* জগদীশ তর্কালঙ্কার একজন প্রধান নৈয়ায়িক। ইনি ন্যায়-শাস্ত্রের টীকা করিয়া লোক-প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

তথায় ক্ষণকালও অবস্থান করিলেন না। পূর্ব্বের ন্যায় মহাদর্পে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। জগন্নাথ বাড়ীতে আহার করিতে গিয়াছিলেন, এই ব্যাপারের কিছুই অবগত ছিলেন না, শেষে চতুষ্পাঠীতে আসিয়া সমুদয় শুনিলেন। অভ্যাগত পণ্ডিত আতিথ্য গ্রহণ না করিয়া চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া জগন্নাথ হৃদয়ে আঘাত পাইলেন; তিনি আর কালবিলম্ব করিলেন না, রমাবল্লভের উদ্দেশে টোল হইতে প্রস্থান করিলেন। পথে রমাবল্লভের সহিত সাক্ষাৎ হইল। জগন্নাথ আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহাকে চতুষ্পাঠীতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিলেন। রমাবল্লভ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। জগন্নাথ শেষে বিনীতভাবে কহিলেন,

"মহাশয়! জগদীশ-প্রণীত গ্রন্থের এক স্থলে আমার বড় সন্দেহ আছে। যখন অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন, তখন আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিলে সাতিশয় উপকৃত হইব।"

রামবল্লভের ক্রোধ তখনও শান্ত হয় নাই। তিনি তীব্রভাবে কহিলেন,

"আর সেই বিতণ্ডাবাদী রঘুদেবের মুখ দর্শনে ইচ্ছা নাই। তুমি প্রশ্ন উত্থাপন কর, আমি এইখানেই তাহার উত্তর দিব।'

জগন্নাথ অপ্রতিভ বা বিচলিত হইলেন না। তিনি ন্যায়শাস্ত্রের এমন একটি দুরূহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, রমাবল্লভ অনেক ভাবিয়াও তাহার উত্তর ঠিক করিতে পারিলেন না। এদিকে জগন্নাথ বিশেষ সূক্ষ্ম যুক্তির সহিত 'ন্যায়-শাস্ত্র-ঘটিত প্রত্যেক কথার মীমাংসা করিতে লাগিলেন। রমাবল্লভ জগন্নাথের শাস্ত্রীয় জ্ঞানের গভীরতা, যুক্তি-প্রয়োগ-নৈপুণ্য ও সূক্ষ্ম-বিচার-প্রণালী দেখিয়া, বিস্মিত ও চমকিত হইলেন। ক্রমে তাঁহার দর্প অন্তর্হিত হইল। তিনি জগন্নাথের মুখে জটিল ন্যায়শাস্ত্রের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে পুনর্ব্বার টোলে

সমাগত হইলেন। আর তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় উদ্ধতভাব রহিল না। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ষোড়শবর্ষীয় বালকের নিকট ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে পরাজিত হইয়া, পরম পরিতোষসহকারে ত্রিবেণীর চতুষ্পাঠীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। অতিথি বিমুখ হওয়াতে রঘুদেব সশিষ্য অনাহারী ছিলেন। এক্ষণে রমাবল্লভের ভোজন শেষ হইলে তিনি সাতিশয় আহ্লাদসহকারে আহার করিলেন।

জগন্নাথ এইরূপে সাত আট বৎসর ত্রিবেণীর চতুষ্পাঠীতে থাকিয়া ন্যায় ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শাস্ত্রানুশীলন ও শাস্ত্রীয় আলাপ তাঁহার বিশুদ্ধ আমোদ ছিল। তিনি বিশিষ্ট অভিনিবেশসহকারে সকল শাস্ত্রই আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিতেন। শিক্ষা তাঁহার অন্তঃকরণ প্রশস্ত করিয়াছিল, ভূয়োদর্শন তাঁহার বিচারশক্তি মার্জ্জিত করিয়াছিল, এবং প্রগাঢ় কর্ত্তব্য-জ্ঞান তাঁহার স্বভাব উন্নত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি সাধনায় অটল, সহিষ্ণুতায় অবিচলিত এবং অধ্যবসায়ে অনলস ছিলেন। যাঁহার সহিত তাঁহার একবার মাত্র শাস্ত্রালাপ হইত, তিনিই তাঁহাকে অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া সম্মান করিতেন। এইরূপে তাঁহার পাণ্ডিত্য-খ্যাতি চারি দিকে প্রসারিত হইল। তিনি বাল্যে দুঃশীল ও দুষ্কর্ম্মরত ছিলেন, যৌবনে সুশীল ও সৎকর্ম্মান্বিত হইয়া শাস্ত্রা-লোচনায় মনোনিবেশ করিলেন।

ক্রমে রুদ্রদেবের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল। নব্বই বৎসর বয়সে রুদ্রদেব ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন। রুদ্রদেব নিরতিশয় দরিদ্র ছিলেন, এজন্য পুত্রের জন্য কিছুরই সংস্থান করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোন ক্ষোভ জন্মে নাই। তিনি পুত্রের অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিকেই তদীয় ভাবী জীবনের একমাত্র সম্বল বিবেচনা করিতেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, জগন্নাথ আপনার বিদ্যার প্রভাবে অনায়াসে জীবিকানির্ব্বাহে সমর্থ হইবে। এইরূপ আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর

করিয়াই তিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিতেন ; কোন বিরাগ অথবা কোন চিন্তা একদিনের জন্যও তাঁহার প্রসন্নতা কলুষিত করে নাই। তিনি সংযতভাবে আপনার কার্য্য করিতেন, এবং আপনার কার্য্য করিয়াই আপনি পরিতৃপ্ত হইতেন। তিনি যে অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, যে অবস্থা তাঁহাকে এক মুষ্টি অন্নের জন্য ঘর্ম্মাক্তকলেবর করিয়া তুলিয়াছে, সে অবস্থার জন্য কখনও আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার প্রশান্তভাব অটল ও অপরিমেয় ছিল, তিনি অমূল্য পুত্র-রত্নের অধিকারী হইয়া আপনাকে মহাভাগ্যবান্ ও সমৃদ্ধ বিবেচনা করিতেন। রুদ্রদেব সুখী ও সন্তুষ্ট ছিলেন। ঘোরতর দরিদ্রতা কখনও তাঁহার প্রসন্ন হৃদয়ে কালিমার সঞ্চার করে নাই।

পিতৃবিয়োগ-সময়ে জগন্নাথের বয়স চব্বিশ বৎসর হইয়াছিল। এই তরুণ বয়সে সংসারের ভার পড়াতে তিনি চারি দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। গৃহে প্রায় কিছুরই সংস্থান ছিল না। রুদ্রদেবের সম্পত্তির মধ্যে দুইটি পিত্তলের জলপাত্র, যৎকিঞ্চিৎ তৈজস ও বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা উপস্বত্বের একখণ্ড নিষ্কর ভূমি ছিল। জগন্নাথ ঐ সামান্য সম্পত্তির প্রায় সমস্তই বিক্রয় করিয়া, পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন, কেবল মাতৃষসার একান্ত অনুরোধে পিত্তলের জলপাত্র দুইটি গৃহে রাখিলেন। এইরূপে সর্ব্বস্বান্ত হওয়াতে জগন্নাথের কষ্টের অবধি রহিল না। দিনান্তে উদরান্ন সংগ্রহ করা দুর্ঘট হইয়া উঠিল। তিনি অপরের নিকট হইতে গৃহকর্ম্মের উপযোগী দ্রব্যাদি চাহিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুরবস্থার একশেষ হওয়াতে তাঁহাকে অর্থ উপার্জ্জনের পথ দেখিতে হইল। জগন্নাথ চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে তিনি অধ্যাপকের নিকট হইতে "তর্কপঞ্চানন" উপাধি প্রাপ্ত হন।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কোনরূপে একটি টোল খুলিয়া ছাত্রদিগকে

শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অধ্যাপনাগুণে নানাদেশ হইতে শিক্ষার্থী আসিতে লাগিল। জগন্নাথ সুনিয়মে সকলকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অদ্ভুত পাণ্ডিত্য-বলে ক্রমে তাঁহার খ্যাতি বাড়িয়া উঠিল, নানা স্থান হইতে নিমন্ত্রণ-পত্র আসিতে লাগিল, অনেক ধর্ম্মপরায়ণ ভূস্বামী তাঁহাকে নিষ্কর ভূমি দিতে লাগিলেন। রুদ্রদেবের আশা ফলবতী হইল। আপনার বিদ্যাবুদ্ধির বলে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন অনেক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া উঠিলেন।

সুপণ্ডিত ও সুবিদ্বান্ বলিয়া জগন্নাথ এমন মাননীয় ছিলেন যে, অনেক বড় বড় লোক তাঁহাকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। নন্দকুমার রায় এই সময়ে মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ান ছিলেন। নবাবের দরবারে তাঁহার বিশিষ্ট ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। দেওয়ান নন্দকুমার জগন্নাথকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। একদিন নবাব নন্দকুমারের মুখে জগন্নাথের অলৌকিক পাণ্ডিত্যের বিবরণ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। নন্দকুমার এজন্য জগন্নাথকে পত্র লিখিলে জগন্নাথ নির্দ্দিষ্ট দিনে নবাবের দরবারে উপনীত হন। সেই সময় সমাগত মৌলবীগণ জগন্নাথকে ধর্ম্মবিষয়ে কয়েকটি দুরূহ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে জগন্নাথ বিলক্ষণ শিষ্টতাসহকারে সরল ভাষায় তাহার যথার্থ উত্তর দান করেন। নবাব ইহাতে সাতিশয় প্রীত হইয়া জগন্নাথকে হস্তী, ঘোটক প্রভৃতি পারিতোষিক দেন। কিন্তু হস্তী, ঘোটক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পক্ষে বিড়ম্বনার বিষয় বলিয়া জগন্নাথ কেবল নিশান, ডঙ্কা ও পারসীক ভাষায় নিজ নামাঙ্কিত মোহর গ্রহণ করেন, এবং নবাবের নিকট দ্বিতল ইষ্টকালয় নির্ম্মাণের, যান আরোহণের ও আপনার ইচ্ছানুসারে বাড়ীতে নওবাৎ বসাইবার অনুমতি লইয়া আবাস-গৃহে প্রত্যাগত হন। এই অবধি নবাবের দরবারে জগন্নাথের সম্ভ্রম ও খ্যাতি বাড়িয়া উঠে। মুর্শিদাবাদের নবাব ও দেওয়ান

নন্দকুমার ব্যতীত কলিকাতার প্রধান শাসনকর্ত্তা স্যার. জন শোর সাহেব *, প্রধান বিচারপতি স্যার উইলিয়ম জোন্স সাহেব †, শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ, বর্দ্ধমানের মহারাজ ত্রিলোকচন্দ্র বাহাদুর, নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রভৃতি বড় বড় লোকের নিকট জগন্নাথের বিশিষ্ট সম্ভ্রম ছিল। ইঁহারা অবকাশ পাইলেই জগন্নাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। সে সময়ে আমাদের দেশের ধনিগণ বিদ্যার যথোচিত সমাদর করিতেন। তাঁহাদের নিকট লক্ষ্মীর ন্যায় সরস্বতীরও সমুচিত সম্মান ছিল। তাঁহারা নিষ্কর ভূমি বা অর্থ দিয়া দেশের প্রধান প্রধান অধ্যাপকের গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধা করিয়া দিতেন। এইরূপ অর্থ-সাহায্য পাওয়াতে পণ্ডিতগণ নিশ্চিন্ত মনে শাস্ত্রানুশীলন করিতেন। তাঁহাদের কোন অভাব বা কোন সাংসারিক ভাবনা ছিল না। অমৃতময়ী সরস্বতীশক্তির উপাসনা করাই তাঁহাদের একমাত্র কার্য্য ও আমোদ ছিল। তাঁহারা সংযতচিত্তে এই উপাসনাতেই সময়ক্ষেপ করিতেন এবং সংযতচিত্তে এই উপাসনা করিয়াই আপনাদের দেশকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতেন ‡।

---

* স্যার্ জন শোর এদেশে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসিয়া ক্রমে গবর্ণরের পদ প্রাপ্ত হন। ইঁহার সময়ে বারাণসী ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত হয়। ইনি শেষে লর্ড টেনমাউথ নামে প্রসিদ্ধ হন।

† স্যার উইলিয়ম জোন্স সুপ্রিমকোর্টের জজ ছিলেন। সংস্কৃতে ইঁহার বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি ইংরাজীতে সংস্কৃত "অভিজ্ঞানশকুন্তল" নাটকের অনুবাদ করেন।

‡ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সমকালে ন্যায়শাস্ত্রব্যবসায়ী হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্ব্বভৌম, প্রমথনাথ ন্যায়পঞ্চানন, ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, রামানন্দ বাচস্পতি, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন, ষড়্দর্শনবেত্তা শিবরাম বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার,

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে বিশিষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু প্রথমে কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত জগন্নাথের সদ্ভাব ছিল না; প্রত্যুত অনেক সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র জগন্নাথের প্রতি বিদ্বেষের পরিচয় দেন। একদা কৃষ্ণচন্দ্র রায় আপনার সভাপণ্ডিত গুপ্তপল্লী-নিবাসী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে কহেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে একটি নূতন ভাবের কবিতা রচনা করিতে পারিলে এক শত রৌপ্য মুদ্রা ও এক শত বিঘা নিষ্কর ভূমি পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। উপস্থিত কবি বলিয়া বাণেশ্বরের বিশিষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। সকলেই তাঁহার কবিত্বের প্রশংসা করিত; কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় এক্ষণে বাণেশ্বর কবিতারচনার্থ নূতন ভাব চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বহু চিন্তাতেও কোন অভিনব ভাব সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, শেষে সপ্তম দিবসে কোনরূপে একটি কবিতা রচনা করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে শুনাইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র বাণেশ্বরের কবিতার এক এক খণ্ড প্রতিলিপি আপনার অধিকৃত সমাজের পণ্ডিতমণ্ডলীতে পাঠাইয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যিনি এক মাসের মধ্যে সংস্কৃত কিংবা প্রাকৃত ভাষায় এই ভাবের কবিতা বাহির করিতে পারিবেন, তাঁহাকে এক শত রৌপ্য মুদ্রা সহিত এক শত বিঘা নিষ্কর ভূমি পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। পণ্ডিতগণ পুরস্কার লাভের প্রত্যাশায় নানা গ্রন্থ আলোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও বাণেশ্বরের কবিতার অনুরূপ ভাব দেখিতে পাইলেন না। অগত্যা তাঁহাদিগকে কবিতাটিকে নূতন বলিয়া স্বীকার করিতে হইল। ইহার কিছু দিন

মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার, কান্ত বিদ্যালঙ্কার, শঙ্কর তর্কবাগীশ, গুপ্তপাড়া-নিবাসী প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান ছিলেন। নবদ্বীপের কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী ভূস্বামিগণ অর্থ দিয়া ইঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন।

পরে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কোন কার্য্য উপলক্ষে কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে বাণেশ্বরের লিখিত কবিতা, শুনাইয়া, উহা নূতন ভাবের কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। জগন্নাথ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সস্মিত মুখে প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি তুলসীদাসের লিখিত অবিকল ঐ ভাবের পদ * আবৃত্তি করিয়া কহিলেন, কবিতাটির ভাব ঐ পদ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই সময়ে বাণেশ্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র গ্রন্থান্তরের ভাব হরণ জন্য কুপিত হইয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করাতে তিনি কহিলেন,

"আমি বহু আয়াসেও নূতন ভাব সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অগত্যা ঐ পদটি অবলম্বন পূর্ব্বক কবিতা রচনা করিয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, সংস্কৃত-শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতেরা হিন্দী ভাষার অনুশীলন করেন না, সুতরাং তাঁহারা সংস্কৃত গ্রন্থে ঐ ভাব দেখিতে না পাইয়া, আমার কবিতাটীকে নূতন বলিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু এই দুরন্ত পণ্ডিত যে হিন্দী গ্রন্থ পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহা জানিতাম না।"

কৃষ্ণচন্দ্র বাণেশ্বরের কথায় আর কিছু না বলিয়া হৃষ্টচিত্তে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে উখড়া পরগণায় একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি ও শত মুদ্রা প্রদান করিয়া কহিলেন,

"এই বাটীতে আপনার চণ্ডীপাঠের বৃত্তি নাই। কি প্রকারে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়?"

জগন্নাথ কৃষ্ণচন্দ্রের সগর্ব্ব বাক্যে বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন,

"বর্দ্ধমানের মহারাজ প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী ভূস্বামিগণ থাকাতে আমার অন্ন-সংস্থানের কোন কষ্ট নাই।"

---

* তুলসীদাসের প্রণীত পদটি এই:—

"জগ্‌মে তোম, যব আয়া সব হাঁসা তোম্ রোয়।
এয়সা কাম করো পিছে হাঁসি না হোয়॥"

কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যোৎসাহ ও গুণগ্রাহিতায় আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতেন, এক্ষণে জগন্নাথের মুখে অপরের উৎকর্ষসূচক বাক্য শুনিয়া যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু সে সময়ে জগন্নাথকে কিছু বলিলেন না, সমাদরের সহিত তাঁহাকে বিদায় করিয়া তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে তৎপর রহিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কোন ব্যক্তির প্রার্থনা অনুসারে ব্রাহ্মণের তুলসীমালাধারণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আপনার সভাপণ্ডিতগণের সাহায্যে ঐ ব্যবস্থার অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিতে যথাশক্তি প্রয়াস পান। কিন্তু তর্কপঞ্চাননের অসীম পাণ্ডিত্যে তাঁহার প্রয়াস সর্ব্বাংশে বিফল হয়। কৃষ্ণচন্দ্র জগন্নাথের প্রতি পূর্ব্বেই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে আপনার প্রয়াস বিফল হওয়াতে তাঁহার ক্রোধ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

এই সময়ে হিন্দুসমাজে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অসীম প্রতাপ ও প্রভুত্ব ছিল। সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত। তিনি ইচ্ছা করিলে যে কোন ব্যক্তিকে জাতিচ্যুত করিতে পারিতেন। তাঁহার ইচ্ছা হইলে জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তিও পুনর্ব্বার আপনার সমাজে উঠিতে পারিত। এবিষয়ে কেহই সে সময়ে তাঁহার ক্ষমতাস্পর্দ্ধী হন নাই। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র আশানুরূপ অর্থ না পাইলে সমাজভ্রষ্ট ব্যক্তির সমন্বয়ের অনুমতি দিতেন না। ইহাতে অনেকেই জাতিচ্যুত হইলে তাঁহাকে বহু অর্থ দিয়া জাতিতে উঠিত। ত্রিবেণীর নিকট বিশপাড়া নামে একখানি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোন অপবাদে সমাজচ্যুত হওয়াতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহের প্রত্যাশায় দীর্ঘকাল তাঁহার নিকট অবস্থান করেন, ব্রাহ্মণের আগ্রহ দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বহু অর্থ প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণ ধনশালী ছিলেন না, সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্রের প্রার্থনা পূরণে একান্ত অসমর্থ হইয়া কাতরভাবে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নিকট

আসিলেন। জগন্নাথ দরিদ্রব্রাহ্মণের এইরূপ দুরবস্থায় বড় দুঃখিত হইলেন। তিনি সে সময়ে অনেক আশ্বাস দিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় করিলেন। যেরূপেই হউক, ঐ নির্দ্ধন ব্যক্তির উপকার করিতে জগন্নাথ এক্ষণে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন। ইহার কিছুদিন পরে দুর্গোৎসব আরম্ভ হইল। এই উপলক্ষে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জগন্নাথের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। জগন্নাথ ইঁহাদিগকে কহিলেন,

"কোন ব্যক্তি কর্ম্মদোষে বা অপবাদবিশেষে পতিত হইলে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের ব্যবস্থা অনুসারে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতিতে উঠিতে পারে। এবিষয়ে নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র হস্তক্ষেপ করেন কেন? তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিত নহেন, স্বাধীন রাজাও নহেন; সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। আমি শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগকে সমাজে তুলিতে ইচ্ছা করি।"

জগন্নাথের এইরূপ সাহস ও স্পষ্টবাদিতা দেখিয়া সমাগত ব্যক্তিগণ কিছুকাল নিরুত্তর রহিলেন। পরে তাঁহাদের অনেকে কহিলেন,

"রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সাতিশয় প্রতাপশালী। তাঁহার অমতে কোন কাজ করিলে বিপদ ঘটিতে পারে।'

জগন্নাথ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,

"আপনারা কিছুমাত্র ভীত হইবেন না। আমি শীঘ্র বিশপাড়া গ্রামের একজন ব্রাহ্মণের সমন্বয় করিব।"

সকলে জগন্নাথের এইরূপ তেজস্বিতায় সন্তুষ্ট হইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে দরিদ্র ব্রাহ্মণের সমন্বয় কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। ক্রমে অনেকে আসিয়া জগন্নাথের ব্যবস্থা লইয়া জাতিতে উঠিতে লাগিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইহা শুনিয়া সাতিশয় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি

জগন্নাথকে অপ্রতিভ ও অপমানিত করিতে অনেক চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু সহসা কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

কিছু দিন পরে কৃষ্ণচন্দ্র বাজপেয় নামে একটি সমৃদ্ধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কাশী, মিথিলা, দ্রাবিড় প্রভৃতি দূরতর জনপদের অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঐ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হন। পনর দিন পর্য্যন্ত মহতী সভায় এই পণ্ডিতগণের বিচার হয়। বলা বাহুল্য, জগন্নাথ এই মহাযজ্ঞে নিমন্ত্রিত হন নাই। নিমন্ত্রণ না হইলেও তিনি আপনার পাণ্ডিত্য-খ্যাতি অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত এক শত শিষ্য সমভিব্যাহারে কৃষ্ণনগরে আগমন করেন, এবং সভায় উপনীত হইয়া সমাগত পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাজিত করিয়া তুলেন। কিন্তু জগন্নাথ কৃষ্ণচন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই। রাজা বহু অনুরোধ করিলেও তাঁহার দ্রব্য গ্রহণ না করিয়া নিজ ব্যয়ে ভোজনাদি করেন। পরে যজ্ঞ শেষ হইলে জগন্নাথ ছাত্রদিগকে ত্রিবেণীতে পাঠাইয়া, স্বয়ং মুর্শিদাবাদে উপনীত হন, এবং দেওয়ান নন্দকুমারকে সমুদয় ঘটনা জানাইয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে অনুরোধ করেন। নন্দকুমার জগন্নাথকে গুরুর ন্যায় সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। এক্ষণে তাঁহার প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শিত হওয়াতে নন্দকুমার কৃষ্ণচন্দ্রের উপর সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে নবাবের সরকারে কৃষ্ণচন্দ্রের বার লক্ষ টাকা রাজস্ব বাকী ছিল। এজন্য দেওয়ান নবাবকে কহিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে মুর্শিদাবাদে আনিতে এক শত পদাতিক পাঠাইয়া দিলেন। নবাব তাঁহাকে এক সপ্তাহের মধ্যে সমুদয় বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিতে কহিলেন, এবং উহার অন্যথা হইলে তাঁহার প্রতি গুরুতর দণ্ড বিহিত হইবে বলিয়া ভয় দেখাইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র নবাবের কথায় ম্রিয়মাণ হইলেন। জগন্নাথের সহিত যে দেওয়ান নন্দকুমারের বিশেষ সদ্ভাব আছে তাহা তিনি জানিতেন। সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্র এক্ষণে

জগন্নাথের শরণাপন্ন হইতে অভিলাষী হইলেন। পরে তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, জগন্নাথ মুর্শিদাবাদেই অবস্থিতি করিতেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র অবিলম্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাঁহার করুণাপ্রার্থী হইলেন। জগন্নাথ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে আপনার শরণাগত দেখিয়া, আর তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইলেন না; দেওয়ান নন্দকুমারের নিকট যাইয়া তাঁহার বিমুক্তির প্রস্তাব করিলেন। নন্দকুমার নবাবকে কহিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে উপস্থিত দায় হইতে আপাততঃ নিষ্কৃতি দিলেন। এই অবধি জগন্নাথের সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের সৌহার্দ্দ জন্মিল; ইহার পর আর কখনও তাঁহাদের এই সৌহার্দ্দের ব্যত্যয় হয় নাই।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এই সময় আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক ও পণ্ডিত ছিলেন। পাণ্ডিত্যের অনুরূপ তাঁহার অর্থ-সঙ্গতি ছিল না। এজন্য অনেক বিদ্যোৎসাহী ভূস্বামী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জগন্নাথের একখানি অতি জীর্ণ পর্ণ-কুটীর মাত্র ছিল। জগন্নাথ এক্ষণে ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যথানিয়মে দুর্গোৎসব করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ তাঁহাকে বহুলাভের একখণ্ড ভূ-সম্পত্তি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বিষয় নানা অনর্থের মূল বলিয়া জগন্নাথ উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু নবকৃষ্ণ ইহাতে বিরত হইলেন না। তিনি জমীদারী সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্যভার আপনার হস্তে রাখিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাঁহাকে সম্পত্তি গ্রহণ করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ আর তাঁহার অনুরোধ লঙ্ঘনে সমর্থ হইলেন না; একখানি ক্ষুদ্র পরগণা গ্রহণপূর্ব্বক রাজা নবকৃষ্ণের বাসনার সম্মান রক্ষা করিলেন। নবদ্বীপের অধিপতি ও বর্দ্ধমানের মহারাজ ও রাজা নবকৃষ্ণের এই সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই

জগন্নাথের অসাধারণ বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাঁহাকে নিষ্কর ভূমি দান করেন।

সৌভাগ্য বৃদ্ধির সহিত জগন্নাথের বংশও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার দুই পুত্র ও তিন কন্যা হইয়াছিল। প্রত্যেক পুত্রের পাঁচটী করিয়া পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সুতরাং জগন্নাথের দুই পুত্র ও দশ পৌত্র বর্ত্তমান ছিল। জ্যেষ্ঠ পৌত্র ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌম সংস্কৃতশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। জগন্নাথের উপযুক্ত পৌত্র বলিয়া লোকে ইঁহার সম্মান করিত। জগন্নাথ অনুরূপ পৌত্র লাভে সন্তুষ্ট হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি ইহার মধ্যে হৃদয়ে একটি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। জগন্নাথের বয়স ৬২ বৎসর, এই সময় পতিপ্রাণা দ্রৌপদীর পরলোক-প্রাপ্তি হয়। জগন্নাথ মহা সমারোহে পত্নীর শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু ভার্য্যাবিয়োগে তাঁহার যে নিদারুণ দুঃখের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা দূর হইল না। অনেকে জগন্নাথকে পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু জগন্নাথ তাঁহাদের কথায় কখনও কর্ণপাত করেন নাই।

স্ত্রী-বিয়োগের পর জগন্নাথ ঈশ্বর-চিন্তায় অধিকতর আসক্ত হইলেন। তিনি রাত্রিশেষে শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বাহিরে আসিতেন, পরে অধ্যাপনাকার্য্য শেষ করিয়া স্নান, পূজা ও ভোজনের পর পারিবারিক বিষয়ের ব্যবস্থা করিতেন। অবশিষ্ট সময় গ্রন্থপ্রণয়ন, অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের সহিত সদালাপ ও প্রতিবেশী-দিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণে অতিবাহিত হইত। সায়ংকালে জগন্নাথ নির্জ্জনস্থানে বসিয়া, নিবিষ্টচিত্তে ঈশ্বরচিন্তা করিতেন; কোন গুরুতর ঘটনা উপস্থিত না হইলে সন্ধ্যার পর কাহারও সহিত আলাপ করিতেন না।

এই সময়ে ইংরেজদিগের শাসন-প্রণালী আমাদের দেশে বদ্ধমূল

হইতেছিল। কিন্তু ইংরেজেরা আমাদের ব্যবস্থাশাস্ত্র ভাল বুঝিতে পারিতেন না। এজন্য যথানিয়মে বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইত না। গবর্ণমেণ্ট এই গোলযোগ দূর করিবার অভিপ্রায়ে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত দ্বারা হিন্দুদিগের ব্যবস্থা সঙ্কলন করিতে অভিলাষী হন। এই সঙ্কলনের ভার জগন্নাথের প্রতি সমর্পিত হয়। জগন্নাথ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ব্যবস্থা-সংক্রান্ত একখানি বৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থ * সঙ্কলন করেন। যাবৎ তিনি এই কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাবৎ মাসিক পাঁচ শত টাকা পাইতেন। সঙ্কলন-কার্য্য শেষ হইলেও তাঁহার প্রতিমাসে তিন শত টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়। স্যার উইলিয়ম জোন্স সাহেবের সহিত জগন্নাথের বিশিষ্ট সৌহার্দ্দ ছিল, তিনি ও তাঁহার বনিতা প্রায়ই জগন্নাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন †। সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি হারিংটন সাহেবের সহিতও জগন্নাথের বন্ধুত্ব ছিল। অবসর পাইলেই হারিংটন জগন্নাথের বাটীতে আসিতেন, এবং হিন্দু ব্যবস্থা-সংক্রান্ত বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিলে তাহার মীমাংসা করিয়া লইয়া যাইতেন। বিচারালয়ে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মত সাদরে গৃহীত হইত। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি যে ব্যবস্থা

---

* এই গ্রন্থের নাম, "বিবাদভঙ্গার্ণব সেতু"। ইহা চারিভাগে বিভক্ত হয়। জগন্নাথ কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করেন। কিন্তু অধ্যাপনা-কার্য্যেই তাঁহার অধিক সময় ব্যয় হইত; এজন্য তিনি গ্রন্থ-প্রণয়নে তাদৃশ মনোযোগ দিতে পারেন নাই।

† একদা স্যার উইলিয়ম জোন্স সস্ত্রীক জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে একজন তাঁহাদিগকে পূজার দালানে বসিতে অনুরোধ করিলেন। ইহাতে জোন্স সাহেবের পত্নী সংস্কৃতে কহিলেন, "আবাং ম্লেচ্ছৌ" অর্থাৎ আমরা ম্লেচ্ছ, পূজার দালানে বসিবার অধিকারী নহি। ইহার পর তাঁহারা উভয়েই জগন্নাথের অন্তঃপুরে যাইয়া বিবিধ সদালাপে সকলকে পরিতুষ্ট করেন।

দিতেন, বিচারপতিগণ তদনুসারে বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁহাকে একটি উৎকৃষ্ট মোহর প্রদান করিয়াছিলেন। এই মোহরে "সুধীবর কবি-বিপ্রেন্দ্র শ্রীযুক্ত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য" এই কয়েকটি বাক্য খোদিত ছিল। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন আপনার ব্যবস্থাপত্র সকল ঐ মোহরে অঙ্কিত করিতেন।

আমাদের দেশে এই সমস্ত শান্তিরক্ষণ-কার্য্য সুনিয়মে নির্ব্বাহিত হইত না। দস্যু তস্করেরা অনেক স্থানে যাইয়া উপদ্রব করিত। ইহাদের মধ্যে শ্যাম মল্লিক নামে একজন প্রসিদ্ধ দস্যু-দলপতি ছিল। সে গুপ্তচর দ্বারা জগন্নাথের অন্তঃপুরের অবস্থা অবগত হইয়া, একদা নিশীথ সময়ে হরিসঙ্কীর্ত্তনের ছলে অনুচরবর্গের সহিত জগন্নাথের বাটীর সম্মুখে আসিল। বাটীর লোকেরা সঙ্কীর্ত্তন শুনিবার নিমিত্ত দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। শ্যাম মল্লিক অমনি অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে বাটীর মধ্যে যাইয়া দ্বাররক্ষকদিগকে বন্ধন করিল, পরে অনুচরদিগকে কহিল,

"জগন্নাথ কোথায় আছেন, অনুসন্ধান কর। তিনি ধনশালী ও কৃপণ, তাঁহার ধনে আমার অধিকার আছে। তিনি নিজে আসিয়া আমার প্রাপ্য অংশ প্রদান করুন। কিন্তু সাবধান, অন্তঃপুরচারিণী কামিনীদিগকে স্পর্শ করিও না। উঁহাদের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিলে সমুচিত শাস্তি পাইবে।"

দলপতির কথায় অনুচরেরা জগন্নাথের শয়ন-গৃহের সম্মুখে আসিয়া দ্বার ভগ্ন করিল। জগন্নাথ তৎক্ষণাৎ একখানি ছিন্ন-মলিন বসন পরিধান পূর্ব্বক সবেগে বাহিরে আসিয়া, উচ্চৈঃস্বরে "পণ্ডিত পলাইল, ধর ধর" বলিতে বলিতে দৌড়িতে লাগিলেন। কতিপয় দস্যুও "ধর ধর" বলিতে বলিতে কিছুদূর তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইয়া ফিরিয়া

আসিল। জগন্নাথ এইরূপে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া কিছুকাল এক রজকের গৃহে রহিলেন, পরে বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় নামে তাঁহার একজন ছাত্রের ভবনে লুক্কায়িতভাবে থাকিলেন। এদিকে দস্যুরা বাটির সকল স্থানে অনুসন্ধান করিল; কোথাও জগন্নাথের দেখা না পাইয়া শ্যাম মল্লিকের নিকটে আসিয়া কহিল,

"আমরা সকল স্থানে অনুসন্ধান করিলাম; কোথাও পণ্ডিতের দেখা পাইলাম না। গৃহে স্বর্ণ রৌপ্যের অনেক দ্রব্য আছে, অনুমতি করিলে সমুদয় আপনার নিকট আনয়ন করি।"

শ্যাম মল্লিক বিরক্ত হইয়া বলিল,

"না তাহা কখনও হইবে না। এরূপ করিলে লোকে বলিবে, শ্যাম মল্লিক নীচাশয়, ক্ষুদ্র চোর। যখন পণ্ডিতের দেখা পাওয়া গেল না, তখন এস্থানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। কেহ কোন দ্রব্য আত্মসাৎ করিও না; সকলে নীরবে বাটী হইতে বাহির হও।"

দস্যুগণ নীরবে স্বস্থানে চলিয়া গেল। পর দিন প্রত্যুষে জগন্নাথ অক্ষত শরীরে প্রত্যাগত হইলেন। হুগলীর জজ সাহেব এই সংবাদ পাইয়া জগন্নাথের বাটীতে আসিয়া তাঁহার এই প্রত্যুৎপন্নমতির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি এই বিষয় গবর্ণমেণ্টে জানাইয়া দস্যুগণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অবিলম্বে গবর্ণমেণ্ট হইতে বার জন শান্তিরক্ষক ও একজন জমাদার জগন্নাথের বাটীতে পাহারায় নিযুক্ত হইল। কিন্তু জগন্নাথ দীর্ঘকাল ইহাদিগকে বাটীতে রাখেন নাই। একদা একজন সিপাহি তস্করভ্রমে একটি কৃষ্ণকায় যুবকের বৃষের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিয়াছিল; উহাতে বৃষের একটি পদ ভগ্ন হয়; অন্য এক সময়ে জগন্নাথের কতিপয় কুটুম্ব রাত্রি নয়টার পর বাটীতে প্রবেশকালে শান্তিরক্ষকগণ কর্তৃক অপমানিত হইয়াছিলেন; এই সকল কারণে

জগন্নাথ বিরক্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদনপূর্ব্বক প্রহরীদিগকে বাটি হইতে উঠাইয়া দেন।

এইরূপে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সকলের শ্রদ্ধাস্পদ হন। এইরূপে সকলে আদর ও প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলেন। তিনি সংসারী হইয়া কখনও কোন বিষয়ে অসুবিধা ভোগ করেন নাই। তাঁহার আয় যেমন বাড়িয়াছিল, তেমনি তিনি সৎকার্য্যে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিত। তিনি সমুদয় ছাত্রের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার অনেক ছাত্রও বড় বড় পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। আপনাদের ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ডে এবং অতিথি-সেবাতে জগন্নাথের অনেক অর্থ ব্যয় হইত। কিন্তু ইহাতেও কৃপণ বলিয়া জগন্নাথের অপবাদ ছিল। জগন্নাথ সংসারের সমস্ত বিষয়ের সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিতেন, বোধ হয় এই জন্য তাঁহার উক্ত অপবাদ হইয়াছিল। জগন্নাথ অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে ক্রমে অনেক সম্পত্তির অধিকারী হন; এই সমস্ত সম্পত্তি পাইয়া তিনি এক দিনের জন্যও গর্ব্ব প্রকাশ করেন নাই। যে বিনয় ও শীলতা জীর্ণ পর্ণকুটীরে তাঁহার মুখমণ্ডল শোভিত করিয়াছিল, সুদৃশ্য অট্টালিকার বহুসম্পত্তির মধ্যে এক্ষণে তাহা আরও শোভা বিকাশ করিল। আপনার সুদীর্ঘ জীবনে জগন্নাথ পুত্র ও প্রপৌত্রের মুখ দেখিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কোলব্রুক সাহেব * একদা ঘনশ্যামকে সদর দেওয়ানী আদালতের জজ পণ্ডিত † হইতে অনুরোধ করেন। কোম্পানীর চাকরী গ্রহণ করিলে জাতি যাইবে বলিয়া, ঘনশ্যাম প্রথমে ঐ সম্মানার্হ

---

* কোলব্রুক সাহেব বাঙ্গালায় আসিয়া প্রথমে ত্রিহুতের কলেক্টর হন, পরে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের পদ গ্রহণ করেন। ইনি একজন প্রধান সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। ইনিই প্রথমে বেদ পড়িয়া ইংরাজীতে তাহার বিবরণ প্রকাশ করেন।

† পূর্ব্বে বিচারালয়ে একজন পণ্ডিত থাকিতেন। হিন্দুশাস্ত্রের তর্ক উপস্থিত হইলে ইঁহারা ব্যবস্থা দিতেন। ইঁহাদিগকে জজ পণ্ডিত বলা যাইত।

পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু শেষে তাঁহাকে ঐ পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। জগন্নাথের কনিষ্ঠ পুত্রের মধ্যম পুত্র গঙ্গাধর তর্কভূষণও নদীয়া জেলায় পণ্ডিত ও সদর আমীন হন।

এইরূপ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রে পরিবৃত হইয়া জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সংসারের সুখ ভোগ পূর্ব্বক শেষ দশায় উপনীত হইলেন। একদা তিনি বিজয়া দশমীর দিন অপরাহ্নকালে প্রতিমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভাগীরথীর তটে আগমন করেন। গোধূলি সময়ে প্রতিমা ভাগীরথীর নীরে নিমজ্জিত হইল। জগন্নাথ ধীরভাবে ইহা চাহিয়া দেখিলেন, পরে আত্মীয়দিগকে কহিলেন, "আমি আর গৃহে গমন করিব না, এই স্থলেই শেষের কয়েকদিন অবস্থান করিব।" অবিলম্বে সেই স্থলে পর্ণ-গৃহ নির্ম্মিত হইল। জগন্নাথ সেই গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক ঈশ্বর-চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথম তিন দিন আত্মীয়দিগের বিশেষ অনুরোধে দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন, শেষে গঙ্গাজল তাঁহার একমাত্র পানীয় হয়। নবম দিবসে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। এইরূপে ১২১৪ সালে (খ্রীঃ ১৮০৬ অব্দে) ১১৩ বৎসর বয়সে পবিত্র ভাগীরথীর তীরে পবিত্র-চিত্ত জগন্নাথের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। এত অধিক বয়স হইলেও জগন্নাথের কোনরূপ ইন্দ্রিয়হীনতা বা বিকার লক্ষিত হয় নাই। তিনি বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী ছিলেন। তাঁহার দর্শন ও শ্রবণশক্তি তেজস্বিনী ছিল। মৃত্যুর দুই এক মাস পূর্ব্বে প্রায় চারি পাঁচ ক্রোশ হাঁটিয়া যাইতে পারিতেন। অধ্যাপনা-কার্য্যে তিনি কখনও ঔদাসীন্য দেখান নাই। যথাসময়ে ও যথানিয়মে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। কেবল মৃত্যুর এক মাস কাল পূর্ব্বে উহা হইতে বিরত হন।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছিলেন। তাঁহার দেহ সুগঠিত ও কোমল, বাহু দীর্ঘ, নাসিকা উন্নত, ললাট প্রশস্ত এবং চক্ষু উজ্জ্বল

ছিল। দেখিলেই তাঁহাকে অসাধারণ বুদ্ধিমান্ বলিয়া বোধ হইত। তিনি এক বেলা আহার করিতেন। আহারের বিশেষ পারিপাট্য ছিল। তাঁহার দশটি পৌত্রবধূর প্রত্যেকে প্রতি দুই মাসে ছয় দিন করিয়া রন্ধন করিতেন। প্রাতঃকাল হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত রন্ধন-কার্য্য হইত। জগন্নাথ ঈষৎ উষ্ণ অন্ন, ব্যঞ্জন খাইতে ভালবাসিতেন, এজন্য পাচিকা উষ্ণ অন্নস্তূপের উপরে জগন্নাথের ভোজনোপযুক্ত ব্যঞ্জনাদি রাখিয়া দিতেন। রন্ধন শেষ হইলে জগন্নাথ পুত্র পৌত্রদিগের সহিত আহারে বসিতেন। যে দিন রন্ধন ভাল হইত, সে দিন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া পাচিকা পৌত্রবধূকে একখান চেলীর কাপড় ও পাঁচ টাকা পারিতোষিক দিতেন। যে দিন রন্ধনে দোষ লক্ষিত হইত, সে দিন পাচিকার প্রতি বিরক্তি দেখাইতে ত্রুটি করিতেন না। পৌত্রবধূগণ এজন্য যত্নপূর্ব্বক রন্ধন-কার্য্য অভ্যাস করিতেন। যে দিন যাঁহার রন্ধন ভাল হইত, সে দিন তিনি আহ্লাদের সহিত সুবচনীর পূজা করিতেন। জগন্নাথ সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বাসিতেন। তিনি সুধৌত ঢাকাই মলমল পরিধান ও বনাতের পাদুকা ব্যবহার করিতেন। পরিচারক অথবা আত্মীয় ব্যক্তি অপরিষ্কৃতবেশে নিকটে আসিলে তাঁহার যারপরনাই বিরক্তি জন্মিত।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের স্মৃতি-শক্তি সাতিশয় বলবতী ছিল। কথিত আছে, তিনি সংস্কৃত "অভিজ্ঞানশকুন্তল" নাটকের আদ্যোপান্ত না দেখিয়া আবৃত্তি করিতে পারিতেন। তাঁহার স্মরণ-শক্তির সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। এক দিন জগন্নাথ স্নান করিয়া ঘাটে বসিয়া আহ্নিক করিতেছেন, এমন সময়ে দৈবাৎ দুই সাহেব সেই স্থানে নৌকা হইতে নামিয়া পরস্পর কলহ করিতে করিতে মারামারি করিল। এজন্য একজন সাহেব আর একজনের নামে আদালতে অভিযোগ করে। অভিযোগকারী বিচারালয়ে কহিল, ঘাটে কেহই ছিল না,

কেবল এক ব্যক্তি গায় মাটি মাখিয়া বসিয়াছিল। এই ব্যক্তিই জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, সুতরাং সাক্ষী হইয়া জগন্নাথকে আদালতে আসিতে হইল। জগন্নাথ ইংরেজী জানিতেন না, তথাপি অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির প্রভাবে দুই জন সাহেব ঘাটে যে যে কথা কহিয়াছিল, তৎসমুদয় এমন সুপ্রণালীতে আবৃত্তি করিলেন যে, বিচারপতি তাহা শুনিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইয়া জগন্নাথকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

জগন্নাথ আপনার সুদীর্ঘ জীবনে সাধারণের নিকট প্রভূত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কখনও এই সম্মানের অপব্যবহার করেন নাই। ছোট বড়, ইতর ভদ্র, সকলেই তাঁহার নিকট আসিত, সকলেই তাঁহাকে সমাদর ও শ্রদ্ধা করিত। তিনি সকলের সহিতই সরল হৃদয়ে আলাপ করিতেন। হাস্যরসের অবতারণায় তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল; আলাপের সময় তিনি কাহাকেও না হাসাইয়া থাকিতে পারিতেন না। শিশুরা তাঁহার প্রসন্ন বদন ও পরিহাসপ্রিয়তা দেখিয়া আমোদিত হইত, যুবকেরা তাঁহার উদার উপদেশ পাইয়া সন্তোষলাভ করিত, এবং বৃদ্ধেরা তাঁহার শাস্ত্রীয় কথা শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইত। এইরূপে তিনি সকলেরই অধিগম্য ছিলেন, সকলেই তাঁহাকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার চক্ষে নিরীক্ষণ করিত।

জগন্নাথ সাতিশয় প্রিয়ংবদ ছিলেন, কখন কাহারও প্রতি কঠোর বা ইতর ভাষা প্রয়োগ করিতেন না। তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতি কৌশলপূর্ণ ছিল। একদা তাঁহার একটি ছাত্র পরিহাস-প্রসঙ্গে আপনার একজন সহাধ্যায়ীর প্রতি ইতর ভাষা প্রয়োগ করিতেছিল, জগন্নাথ অধ্যাপনার্থ বহির্বাটীতে আসিবার সময়ে উহা শুনিতে পাইলেন। বহির্বাটীর পথে তাঁহার একটি গৃহ-পালিত কুকুর শয়ান ছিল। জগন্নাথ আসিবার সময় তাহাকে বলিলেন,

"মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে পথ প্রদান করুন।

কুক্কুর সরিয়া গেল। জগন্নাথ অধ্যাপনা-গৃহে উপস্থিত হইলেন। একজন ছাত্র ইহা দেখিয়া জগন্নাথকে কহিল,

"কুক্কুরের প্রতি এরূপ সাধুভাষা প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য কি ?'

জগন্নাথ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,

"অভ্যাস মন্দ করা উচিত নহে। কুক্কুরের প্রতি ইতর ভাষা প্রয়োগ করিতে করিতে এক দিন হঠাৎ উহা কোন ভদ্রলোকের প্রতিও প্রয়োগ করিয়া লজ্জিত হইব।

ছাত্রগণ এইকথা শুনিয়া যথোচিত শিক্ষা পাইল।

জগন্নাথের পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে দুইটি পিত্তলের জলপাত্র, দশ বিঘা নিষ্কর ভূমি ও একখানি অতি জীর্ণ পর্ণ-গৃহ মাত্র ছিল। কিন্তু জগন্নাথ অসাধারণ স্বাবলম্বন ও বিদ্যাবলে নগদ এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা, বার্ষিক চারি হাজার টাকা উপস্বত্বের নিষ্কর ভূমি এবং বহুসংখ্যক উদ্যান ও পুষ্করিণী প্রভৃতি রাখিয়া পরলোক-গত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে জগন্নাথ ঐ সকল সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি দশ পৌত্রের প্রত্যেককে দশ হাজার টাকা দান করেন, নিজের শ্রাদ্ধ ও দৌহিত্রদিগের নিমিত্ত ছত্রিশ হাজার টাকা রাখিয়া দেন, অবশিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে সমর্পণ করেন।

অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ন্যায় জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের অসাধারণ ধর্ম্ম-জ্ঞান ছিল ; এজন্য তিনি সকলেরই প্রগাঢ় বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন। বিদ্যা, ধর্ম্ম-জ্ঞান ও স্বাবলম্বন একাধারে সমবেত হইলে মানুষের কেমন উন্নতি হয়, তাহা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জীবন-চরিতে প্রকাশ পাইতেছে। লোকসমাজে যত দিন বিদ্যার সমাদর থাকিবে, যত দিন ধর্ম্ম-জ্ঞান অটল রহিবে, যত দিন স্বাবলম্বন উন্নতির একটি প্রধান উপায় বলিয়া পরিগণিত হইবে, ততদিন এই স্বশক্তি-সমুত্থিত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নাম কখনও বিলুপ্ত হইবে না।

ধর্ম্মনিষ্ঠ দেওয়ান

রামকমল সেন।

সাধনা ও শিক্ষাবলে কিরূপ মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারা যায়; সাধারণের নিকটে কিরূপ শ্রদ্ধাস্পদ হওয়া যায়, এবং দুঃখ ও দারিদ্র্যের সহিত মহাসংগ্রাম করিয়া পরিশেষে কিরূপে বিজয়শ্রী অধিকারপূর্ব্বক সাংসারিক কষ্ট দূর করা যায়, দেওয়ান রামকমল সেনের জীবনী তাহার পরিচয়স্থল! পবিত্র চরিত্রের জন্য রামকমল সেন সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র। কোন অধ্যাপকের উপদেশ তাঁহাকে সুশিক্ষিত ও সুব্যবস্থিত করিয়া তুলে নাই, এবং কোন প্রকার সম্পত্তি বা সৌভাগ্যলক্ষ্মী জীবনের প্রথম অবস্থায় তাঁহার পার্থিব বন্ধন সুখকর করিতে অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু রামকমল সেন সংসারক্ষেত্রে প্রবেশপূর্ব্বক অনেক বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। এই ভূয়োদর্শন-সম্ভূত শিক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষাকেও অধঃকৃত করিয়াছিল। ক্রমে চরিত্রগুণে তাঁহার খ্যাতি ও সমৃদ্ধি বাড়িয়া উঠে। ফলে শিক্ষা, অধ্যবসায় ও চরিত্রগুণে রামকমল সেন উনবিংশ শতাব্দীর এক জন মহৎ লোক বলিয়া পরিচিত। তিনি অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে বহু সম্পত্তির অধিকারী হন, এবং অতি সামান্য চাকরী হইতে সাধারণের বরণীয় হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী গৌরীভা (গরিফা) গ্রামে গোকুলচন্দ্র সেন, নামে বৈদ্যজাতীয় এক ব্যক্তি বাস করিতেন। পারস্য ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। হুগলীতে সেরেস্তাদারী কার্য্য করিয়া তিনি মাসে পঞ্চাশ টাকা মাত্র উপার্জ্জন করিতেন। ইহাতেই তাঁহাকে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে হইত। ক্রমে তাঁহার মদন,

রামকমল সেন

জন্ম—খৃঃ ১৭৮৩ অব্দ, ১৫ই মার্চ্চ।

মৃত্যু—খৃঃ ১৮৪৪ অব্দ, ২রা আগষ্ট।

জন্মস্থান—চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত গরিফা গ্রাম।

রামকমল ও রামধন নামে তিনটী পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়; মধ্যম পুত্র রামকমল খ্রীঃ১৭৮৩ অব্দের ১৫ই মার্চ্চ পরিকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গোকুলচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ আপনাদিগকে প্রসিদ্ধ রাজা বল্লাল সেনের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত করিতেন। বৈদ্যগণ এক সময়ে শিক্ষা, সদাচার ও শাসন-নৈপুণ্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। অনেক বিষয়ে ইঁহারা আজি পর্য্যন্ত পবিত্র ইতিহাসের বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। বৈদ্য-বংশীয় রাজারা এক সময়ে বাঙ্গালার শাসন-ভার গ্রহণপূর্ব্বক যথানিয়মে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে কোন কোন পণ্ডিত ইঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন বটে, কিন্তু ইঁহারা যে বৈদ্য ছিলেন, তদ্বিষয়ে সাধারণের বিশ্বাস অদ্যাপি বিচলিত হয় নাই। যাহা হউক, বৈদ্যগণের ভূয়োদর্শন ও পাণ্ডিত্য অনেকের অনুকরণীয়। ইঁহারা যেমন ব্রাহ্মণের ন্যায় যজ্ঞ-সূত্র ধারণ করেন, তেমনি একসময়ে শাস্ত্রানুশীলনেও ব্রাহ্মণের ক্ষমতাস্পর্দ্ধী হইয়াছিলেন। ইঁহারা যথানিয়মে গুরু-গৃহে বাস করিতেন, যথানিয়মে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক আপনাদের চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসারে অপরের রোগোপশম-ব্রতে দীক্ষিত হইতেন। ইঁহাদের অনেকে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার হইয়া সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া রহিয়াছেন। মাধব কর "নিদান" প্রণয়ন করেন, বিজয় রক্ষিত "বৈদ্যমধুকোষ" প্রচার করেন, বিশ্বনাথ কবিরাজ "সাহিত্য-দর্পণ" রচনা করিয়া যশস্বী হন, চক্রপাণি দত্ত "চক্রদত্ত" লিপিবদ্ধ করিয়া যান, কবিচন্দ্র "রত্নাবলী" রচনা করিয়া সাধারণের বরণীয় হন, এবং ভরত মল্লিক দুরূহ সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা করিয়া সংস্কৃত বিদ্যার্থীদিগের শিক্ষার পথ পরিষ্কৃত করেন। মুসলমান-দিগের আধিপত্যের পূর্ব্বে বৈদ্যগণ বাঙ্গালার অনেক স্থলে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই প্রাচীন ও বিখ্যাত বংশে রামকমল সেনের আবির্ভাব হয়।

রামকমলের পিতা তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না, সুতরাং পুত্রকে যথানিয়মে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। রামকমল প্রথমে শিরোমণি বৈদ্য নামক একজন শিক্ষকের নিকট সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি সর্ব্বদা গুরুর নিকটে নূতন পড়া চাহিতেন। গুরু এজন্য বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেন। রামকমল গম্ভীরভাবে কহিতেন, "যাবৎ তৃপ্তি না হয়, তাবৎ মানুষ আহারে ক্ষান্ত হয় না।" রামকমলের জ্ঞানতৃষ্ণা কিরূপ বলবতী ছিল, এবং রামকমল কিরূপ অধ্যবসায়সহকারে নূতন বিষয় শিখিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা এই বাক্যে স্পষ্ট জানা যাইতেছে। এই সময়ে ইংরেজী শিক্ষার অবস্থা ভাল ছিল না। যাহা হউক রামকমল ইংরেজীর প্রতি ঔদাসীন্য দেখান নাই। তিনি কলিকাতায় আসিয়া ১৮০১ অব্দে কলুটোলার রামজয় দত্তের স্কুলে ইংরেজী শিখিতে প্রবৃত্ত হন। এ সম্বন্ধে রামকমল সেন লিখিয়াছেন, "আমি একজন হিন্দুর স্থাপিত বিদ্যালয়ে ইংরেজী অভ্যাস করি। ঐ বিদ্যালয়ে বালকদিগকে "তুতিনামা" ও "আরব্য উপন্যাস" পড়িতে হইত। ব্যাকরণ ও অভিধান প্রভৃতি কোন পুস্তক প্রচলিত ছিল না।" পূর্ব্বে অধ্যাপনার অবস্থাও অপকৃষ্ট ছিল। খ্রীঃ ১৭৮০ অব্দের পূর্ব্বে আমাদের দেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয় নাই। ১৫০০ অব্দের পূর্ব্বে কেহ কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করেন নাই। বৈদ্যবংশীয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ নামক চৈতন্যের একজন শিষ্য ১৫৬৮ অব্দে চৈতন্যের জীবনচরিত প্রণয়ন করেন। এই চৈতন্য-চরিতই বাঙ্গালায় জীবনী-সংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থ। ইহার পর অন্যান্য গ্রন্থ প্রণীত হয়। পাঠশালার বালকেরা কেবল "গুরুদক্ষিণা ও শুভঙ্করের গণিত-সূত্র" পাঠ করিত। ইহাতে শিক্ষা প্রগাঢ় হইত না। রামকমলের সময়েও শিক্ষার অবস্থা এইরূপ ছিল। এই সময়ে যেমন ভাল বিদ্যালয় ছিল না,

তেমন ভাল পাঠ্যগ্রন্থও প্রচলিত ছিল না। দরিদ্রতাহেতু রামকমল গৃহে শিক্ষক রাখিয়াও বিদ্যাশিক্ষা করিতে সমর্থ ছিলেন না। এইরূপে প্রথম অবস্থায় রামকমলের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে। এ দিকে রামকমলের কোন সংস্থান ছিল না, সুতরাং তাঁহাকে শীঘ্র উদরান্নের সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে হয়। রামকমল আপনার শোচনীয় দশার নিকটে মস্তক অবনত করেন, এবং খ্রীঃ ১৮০০ অব্দের ১৯শে নবেম্বর মহানগরী কলিকাতায় আপনার ভাগ্যপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন।

৮১ বৎসরের অধিককাল গত হইল, একটি সপ্তদশবর্ষীয় দরিদ্র ও অসহায়যুবক কলিকাতার জনতামধ্যে ভীষণ সাংসারিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে কলিকাতা আপনার প্রাচীনভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে প্রধান নগররূপে পরিণত হইতেছিল। কলিকাতা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেণ্ট জব্ চারণক সাহেবের প্রযত্নে সংগঠিত হয়। ১৬৭৮-৭৯ অব্দে চারণক একটি হিন্দু মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ঐ মহিলাকে তিনি সহমরণের অনল কুণ্ড হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। অবলা পরিত্রাতার চিরসহচরী হইবার জন্য তাঁহার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়। ১৬৮৮ অব্দে ব্রিটিশ কোম্পানি গোবিন্দপুর, সূতানুটী ও কলিকাতার জমিদারীস্বত্ব ক্রয় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৭০০ অব্দে উহা ক্রীত হয়। ফেয়ার্লি প্লেস্, কষ্টম হাউস ও কয়লাঘাটের নিকটে কোম্পানি আপনাদের দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কলিকাতার ইদানীন্তন প্রাসাদরাজি ঐ সময়ে অনাগত কালগর্ভে নিহিত ছিল। কতিপয় মাটির ঘর ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। চাঁদপাল ঘাটের দক্ষিণাংশ নিবিড় জঙ্গল ও অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। কলিকাতার আয়তন প্রথমে চিৎপুর হইতে কুলীবাজার পর্য্যন্ত ছিল, ক্রমে উহা সিমুলিয়া, মলঙ্গা, মির্জ্জাপুর ও হোগলকুঁড়িয়া পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া উঠে। ঐ সময়ে কলিকাতার শেঠ ও বসাকগণ

সাতিশয় প্রসিদ্ধ ও সম্পত্তিশালী ছিলেন। ইঁহারা প্রধানতঃ বাণিজ্যেই লিপ্ত থাকিতেন। এই বাণিজ্যের উদ্দেশে ক্রমে ইউরোপীয়, মোগল ও আর্ম্মানীয়েরা আসিয়া কলিকাতায় স্থান পরিগ্রহ করে। কলিকাতা ধীরে ধীরে সংগঠিত ও সমৃদ্ধ হইতে থাকে। ১৭৭৩ অব্দে 'সুপ্রীম কোর্ট' নামক বিচারালয় স্থাপিত হয়। উহার দুই বৎসর পরে পুলিসবিভাগ প্রণালীবদ্ধ হইয়া উঠে। এইরূপে অনেক বিষয়েই কলিকাতার পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়, এবং উহা প্রধান নগরের সম্মানিত পদে অধিরূঢ় হইতে থাকে।

কিন্তু কলিকাতার ঐ বাহ্য উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ উন্নতি হয় নাই। বিদ্যাশিক্ষার অবস্থা কয়েক বর্ষের পর্য্যন্ত অপকৃষ্ট ছিল; ১৮১৭ অব্দে হিন্দুকলেজ স্থাপনের পূর্ব্বে সামান্য লিখন, পঠন ও গণিতই শিক্ষার চরম সীমা ছিল। বাঙ্গালীদিগকে যৎসামান্যভাবে ইংরেজী শিখিয়া সাহেবদিগের সহিত কাজে প্রবৃত্ত হইতে হইত। দেওয়ান রামকমলও এইরূপে প্রথমে ১৮০২ অব্দের ১০ই ডিসেম্বর ক্যামে নামক একজন সাহেবের অধীনে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এই ক্যামে সাহেব কলিকাতার তদানীন্তন প্রধান মাজিষ্ট্রেট বাকুণ্ডোয়ার সাহেবের সহকারী ছিলেন। ইহার পরবর্ত্তী বৎসরের ১০ই ডিসেম্বর রামকমল দারপরিগ্রহ করেন। ঐ বৎসরেই রামকমলের পিতা তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের সিবিল ইঞ্জিনিয়র বেচিন্‌ডেন সাহেবের অধীনে কোনরূপ বিষয়কর্ম্মের উমেদার করিয়া দেন, ১৮০৪ অব্দে রামকমল হিন্দুস্থানী যন্ত্রালয়ে বর্ণসংযোজকের (কম্পোজিটরের) কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ঐ কার্য্যে রামকমলের মাসে আটটি টাকা মাত্র আয় হইত। উহার তিন বৎসর পরে তিনি কলিকাতা চাঁদনী চিকিৎসালয়ে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হন। খ্রীঃ ১৮১২ অব্দে "ফোর্ট উইলিয়ম" কলেজে কর্ণেল রামুলের অধীনে তাঁহার একটি কর্ম্ম হয়। এইরূপে রামকমল অতি

সামান্ত বেতনে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে কার্য্য করিয়া ১৮১৮ অব্দে কলিকাতার "এসিয়াটিক সোসাইটি" নামক প্রসিদ্ধ সভার একজন কেরাণী হন। হিন্দুস্থানী যন্ত্রালয়ে কার্য্য করাতে রামকমলের যে আয় হইত, এই কার্য্যে তাহা অপেক্ষা চারি টাকা মাত্র অধিক আয় হইতে থাকে। যাহা হউক, রামকমল সেন এই স্থানে কার্য্য করিয়া প্রসিদ্ধ সংস্কৃতশাস্ত্রবিৎ ডাক্তার উইলসন্ সাহেবের সহিত বিশেষ পরিচিত হন। উইলসন্ সাহেব সাতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি কখনও গুণের অমর্য্যাদা করিতেন না। উইলসন্ রামকমলের কার্য্যপটুতা, শ্রমশীলতা ও অসাধারণ চরিত্র-গুণ দেখিয়া তাঁহাকে আরও দীর্ঘকাল ঐ বার টাকা বেতনের সামান্য কেরাণীগিরিতে রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি তাঁহার এই যুবক বন্ধুকে গুণানুরূপ উচ্চতর কার্য্যে নিয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অবিলম্বে সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। রামকমল কেরাণীগিরি হইতে এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদকের পদে উন্নীত হইলেন। এই কার্য্যে রামকমলের ভবিষ্য-উন্নতির সূত্রপাত হইল। রামকমল সহকারী সম্পাদকের কার্য্য এমন সুনিয়মে ও দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিলেন যে, তাঁহাকে আর দীর্ঘকাল ঐ অধস্তন পদে থাকিতে হইল না। তিনি শীঘ্র এসিয়াটিক সোসাইটির একজন সদস্য হইলেন। রামকমল এইরূপে উচ্চতর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন; প্রতি কার্য্যেই তাঁহার অধিকতর ক্ষমতা ও দক্ষতা পরিস্ফুট হইতে লাগিল। তাঁহার সৌজন্য, সাধুতা ও সদাশয়তা তাঁহাকে ক্রমে উচ্চতর শ্রেণীতে আরোহিত করিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই রামকমল টাকশালা ও বাঙ্গালা ব্যাঙ্কের দেওয়ান হইলেন। এই গৌরবান্বিত উচ্চ পদে নিযুক্ত হওয়াতে তাঁহার আয়ের পথ প্রসারিত হইল; নিজের ও পোষ্যবর্গের চিরন্তন দুর্দ্দশা ঘুচিয়া গেল, এবং তাঁহার আবাস-ভূমি অমৃতময়ী সারস্বতী-শক্তির সহিত সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর

ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়া উঠিল। যিনি সামান্য বর্ণসংযোজকের কার্য্য করিয়া মাসে আট টাকা মাত্র উপার্জ্জন করিতেন, আপনার ক্ষমতা ও অধ্যবসায়গুণে তিনি এক্ষণে প্রতি মাসে দুই হাজার টাকার সংস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু এইরূপ পদগৌরব ও আয় বর্দ্ধিত হওয়াতে রামকমল এক দিনের জন্যও কোনরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করেন নাই; সমাজে আপনার সামর্থ্য বাড়িয়া উঠিলেও কোনরূপ হিংসা এক দিনের জন্যও তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। বর্ণ-সংযোজকের আসনে বসিয়া রামকমল যেরূপ বিনীতভাবে কার্য্য করিতেন, কেরাণীগিরির মসী-ক্ষেত্রে থাকিয়া রামকমল যেরূপ সরলতা ও সাধুতার পরিচয় দিতেন, দুঃখ দারিদ্র্যের কঠোর আক্রমণে মর্ম্মাহত হইয়া রামকমল যেরূপ ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া সান্ত্বনা পাইতেন, এক্ষণে বাঙ্গালা ব্যাঙ্কের দেওয়ান হওয়াতে সে বিনয়, সরলতা, সাধুতা ও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরের ভাব, তাঁহার হৃদয়কে অধিকতর শোভিত করিয়া তুলিল। সম্পত্তিশালী ও অধিকতর ক্ষমতাপন্ন হইলে যাহারা কেবল আত্মস্বার্থে সংযত হইয়া থাকে, যাহাদের অর্থ কেবল নিজের ও কুপোষ্যবর্গের বিলাসসুখেই ব্যয়িত হয়, তাহাদের সেই সম্পত্তি ও ক্ষমতা দেশের উপকার ও সৌভাগ্যের জন্য না হইয়া, অপকার ও দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়া উঠে। এই মহৎ সত্য দেওয়ান রামকমলের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত ছিল। সমাজে যখন তাঁহার সৌভাগ্য বাড়িয়া উঠিল, প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রম হইতে লাগিল, তখন তিনি সাধারণের হিতকর নানাপ্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। এই সময়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বা সাধারণের কোনরূপ হিতের জন্য যে সমস্ত সমাজ ছিল, দেওয়ান রামকমল তৎসমুদয়ের সহিতই সংসৃষ্ট ছিলেন। তিনি প্রাচীন হিন্দুকলেজের সদস্য হন, সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকের কার্য্য গ্রহণ করিয়া, উহার প্রধান পরিচালক হইয়া উঠেন। দাতব্য

সমাজের সহকারী অধ্যক্ষের আসন পরিগ্রহ করেন, কলিকাতায় চিকিৎসাশাস্ত্রে অধ্যাপনার জন্য যে সভা সংগঠিত হয়, তাহার একজন সদস্য হন, সাধারণ শিক্ষাসমাজের অন্যতম সভ্যের কার্য্য গ্রহণ করেন, স্কুলবুক সোসাইটি নামক সভার একজন প্রধান সদস্যের পদে বৃত হন, এবং কৃষি-সমাজের সহকারী সভাপতি ও চাঁদনী চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ হইয়া উঠেন। দেওয়ান রামকমল সাধারণের হিতকর ঐ সকল প্রধান প্রধান সমাজের সংস্রবে থাকিয়া উহা সুব্যবস্থিত ও উন্নত করিবার জন্য যথাশক্তি পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন। তিনি নগরের স্বাস্থ্যের অবস্থা উৎকৃষ্ট করিবার জন্য সময়ে সময়ে যে সকল সদুপদেশ দিয়াছেন, তাহা কলিকাতা মিউনিসিপালিটির ইতিহাসে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। রামকমল দাতব্য সমাজের হস্তে আপনার কিছু মূল্যবান ভূখণ্ড সমর্পণ করেন। এই সকল কার্য্য ব্যতীত রামকমল আর একটি বিষয়ে আপনার নাম অক্ষয় ও চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি আপনার কার্য্য ও সাধারণের হিতকর নানাপ্রকার বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়াও ১৮৩০ অব্দে একখানি ইংরাজীবাঙ্গালা প্রকাণ্ড অভিধান প্রণয়ন করেন। ঐ অভিধান সাতশত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়। "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" নামক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের সম্পাদক পাদরী মার্শমান সাহেব ঐ অভিধানের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "এক্ষণে এই শ্রেণীর যে সকল গ্রন্থ আছে, তৎসমুদয় মধ্যে উহা সর্ব্বাঙ্গে সম্পূর্ণ ও সমধিক মূল্যবান্। উহা তাঁহার পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অভিজ্ঞতার চিরস্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ। অতীতকালে উহা দ্বারা তাঁহার নাম জাজ্জ্বল্যমান্ থাকিবে।" দেওয়ান রামকমল কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যথারীতি শিক্ষা না পাইলেও আপনার অধ্যবসায়প্রভাবে কিরূপ অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শিতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা মার্শমান সাহেবের ঐ সমালোচনায় পরিস্ফুট হইতেছে।

দেওয়ান রামকমলের হিতৈষিতা কিরূপ বলবতী ছিল, তিনি সাধারণের হিতকর বিষয় সম্পন্ন করিতে কিরূপ ভাল বাসিতেন, তাহা তাঁহার প্রতি কার্য্যেই প্রকাশ হইয়াছে। তিনি নানাপ্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও স্বদেশের সামাজিক কুপ্রথার উচ্ছেদসাধনে উদাসীন রহেন নাই। কলিকাতায় প্রথমে রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ ও মরণাপন্ন ব্যক্তিকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়ার প্রথার বিরুদ্ধে সমুত্থিত হন। দেওয়ান রামকমল প্রথমে মরণাপন্ন ব্যক্তিকে গঙ্গায় নিমজ্জন করিবার রীতির বিরুদ্ধে বদ্ধ-পরিকর হইয়া উঠেন। তিনি ঐ প্রথাকে গঙ্গাতীরে মনুষ্য হত্যা করা বলিয়া, উহার বিরুদ্ধপক্ষ সমর্থন করেন। চড়কপার্ব্বণে লোকে আপনাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিদ্ধ করিত, দেওয়ান রামকমল ঐ প্রথার বিরুদ্ধেও দণ্ডায়মান হন। স্বয়ং একজন পরম ভাগবত প্রগাঢ় হিন্দু হইয়াও রামকমল ঐ সকল অন্ধধর্ম্মমূলক কুপ্রথার বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা তাঁহার মার্জ্জিত বুদ্ধি ও উদারতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

এইরূপ নানাপ্রকার হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া দেওয়ান রামকমল সেন ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হন। অনবরত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে, তিনি তিন সপ্তাহ ভাগীরথীতে বাস করেন; কিন্তু নদী-মারুতে স্বাস্থ্যের কোনরূপ উৎকর্ষ লক্ষিত না হওয়াতে রামকমল শেষে জন্মভূমি গরিফায় প্রত্যাবৃত্ত হন। ৪৪ বৎসর পূর্ব্বে তিনি অতি সামান্য বেশে ও দীনভাবে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; ৪৪ বৎসর পরে তিনি সমৃদ্ধ, গৌরবান্বিত ও সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া ঐ বাসগ্রামে আগমন করেন। মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বে তাঁহার বাক্‌রোধ হয়। রামকমল অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী জানিয়া, গরিফায় আসিবার পূর্ব্বে দুই দিবস কেবল একতারে জপ করেন।

১৮৪৪ অব্দের ২রা আগষ্ট পবিত্র ভাগীরথী তীরবর্ত্তী গরিফা গ্রামে ৬১ বৎসর বয়সে তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হয়।

দেওয়ান রামকমল সেনের মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র এসিয়াটিক সোসাইটি, কৃষিসমাজ, দাতব্যসমাজ প্রভৃতি কলিকাতার প্রায় সকল সভাই আপনাদের গভীর শোক প্রকাশ করেন। সকলেই দেওয়ান রামকমলের অসাধারণ গুণগৌরবের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে মহীয়ান্ করিয়া তুলেন। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার তদানীন্তন সম্পাদক স্বর্গীয় জন ক্লার্ক মার্শমান সাহেবের লেখনী হইতে তাঁহার সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব নির্গত হয়। মার্শমান সাহেব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, "লর্ড হেষ্টিংসের সমকালে আপনার দেশীয়দিগের মধ্যে জ্ঞানালোক বিস্তারের জন্য রামকমল সেন যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। যাহাতে স্বদেশীয়গণ ইউরোপীয় বিজ্ঞান-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠে, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশিষ্ট যত্ন ছিল।" ডাক্তার উইলসন্ সাহেব তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোকগ্রস্ত হইয়া লিখিয়াছিলেন, "যে সকল বিষয়ে আমি এতদ্দেশীয়দিগের সংস্রবে ছিলাম, সে সকল বিষয়ে রামকমল অদ্বিতীয় পরামর্শদাতা ছিলেন। আমি অনেক অংশে তাঁহার বিচার ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়াছি। সংক্ষেপে, যন্ত্রালয়ে, এসিয়াটিক সোসাইটিতে, লিখনপঠনে; টাকশালায়, কলেজে যে স্থানে ও যে সময়েই হউক না কেন, আমরা সর্ব্বদা একীভূত ছিলাম। এই অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ ও অভিন্নহৃদয়তা আজীবন আমার স্মৃতিতে জাগরূক থাকিবে। আবার এই বন্ধু রামকমল সেনের সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়াতে আমি যেরূপ দুঃখিত হইয়াছি, এরূপ দুঃখ কলিকাতার অন্য কোন ব্যক্তির সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়ে হইবে না। * * * যাবৎ আমার প্রাণবায়ু বহির্গত না হইবে, তাবৎ আমি প্রগাঢ় প্রণয়ের সহিত তাঁহাকে স্মরণ করিব।"

দেওয়ান রামকমল সেন আপনার অসাধারণ গুণে এইরূপ বৈদেশিক পণ্ডিতদিগেরও হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি ভগবদ্ভক্ত পরম বৈষ্ণব ছিলেন। আপনার ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকলাপে তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল; তিনি নিয়মিতরূপে একাদশী ও হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেন। পরিচ্ছদে তাঁহার কিছুমাত্র আড়ম্বর ছিল না। তিনি উদ্ভিদ্-ভোজী ছিলেন। সামান্য অশনবসনেই তাঁহার পরিতৃপ্তি হইত; জল ও দুগ্ধ তাঁহার পানীয় ছিল। দীর্ঘকাল অসুস্থ থাকাতে তিনি অল্প পরিমাণে চা পান করিতেন। সময়ে সময়ে তিনি স্বপাক ভোজন করিতেন। পুরাণশ্রবণে ও পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রালাপে অপরাহ্ণ কাল অতিবাহিত হইত। শীতকালের রাত্রিতে তিনি আপনার সন্তানদিগকে অগ্নি-কুণ্ডের চারিদিকে বসাইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। তাঁহার পবিত্র জীবন কেবল সরলতা ও আড়ম্বর-শূন্যতার পরিচয়-স্থল ছিল।

রামকমল অতিশয় উদার-প্রকৃতি ছিলেন। কোনরূপ সঙ্কীর্ণ মতে তাঁহার বুদ্ধি কলুষিত ছিল না। এজন্য ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এবং ডাক্তার উইলসন, কোলব্রুক, সার্ এডওয়ার্ড রায়ান্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মাননীয় ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। ইঁহাদের সকলের সহিত তাঁহার বিশিষ্ট সৌহার্দ্দ ছিল। সকলেই সরলভাবে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

রামকমলের বিশিষ্ট সামাজিকতা ছিল, সকলের মধ্যে যাহাতে সৌহার্দ্দ ও সমবেদনা জন্মে, তদ্বিষয়ে তিনি যথোচিত প্রয়াস পাইতেন। প্রতিবৎসর তাঁহার গৃহে প্রায় শত বৈদ্য একত্র হইয়া জলযোগ করিতেন। তিনি নিজে যাইয়া ইঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন।

প্রাচীন সময়ে বাঙ্গালার কতিপয় ব্যক্তি অতি হীন অবস্থা হইতে সমৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। নবকৃষ্ণ দীনভাবে ঘোড়াবাজারে বেড়াইতেন। রামদুলাল দে পাঁচ টাকা বেতনে মদনমোহন দত্তের সরকারী

করিতেন। মতিলাল শীল মাসে আট টাকা উপার্জ্জন করিয়া কষ্টে কাল কাটাইতেন। রামকমল বর্ণসংযোজকের কার্য্য করিতেন। শেষে ইনি আপনার পরিশ্রম ও অধ্যবসায়বলে স্বদেশের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন পরিগ্রহ করেন। রামকমল সেনের জীবনী সকলের আদর্শ-স্থানীয়, যে হেতু রামকমল কোন কলেজে যথারীতি শিক্ষালাভ করেন নাই; দারিদ্রতার সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া মাসে আটটী টাকা মাত্র উপার্জ্জন করিতেন। পরিশেষে অসাধারণ পরিশ্রম, চরিত্র-গুণ, অধ্যবসায় ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে তিনি ঐ মহাসংগ্রামে বিজয়শ্রী অধিকার করেন। তাঁহার উন্নতি ধীরে ধীরে হয় নাই। তিনি পার্থিব সুখভোগের জন্য আপনার ধন রাশীকৃত করিয়া রাখেন নাই। তাঁহার তত্ত্বে যথানিয়মে ঐ ধনের সদ্ব্যয় হইয়াছে। স্বদেশীয়দিগকে বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ করিবার জন্য তিনি বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন; অধিকন্তু নগরের নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগের দুরবস্থামোচনে, পীড়িতদিগকে ঔষধপথ্য দানে ও স্বাস্থ্যের উৎকর্ষবিধানে তাঁহার যেমন অর্থব্যয় হইয়াছে, তেমনি পরিশ্রম ও মনোযোগ দেখা গিয়াছে।

বাঙ্গালীর মধ্যে রামকমল সেন যথার্থ বরণীয় ব্যক্তি। তাঁহার জীবন-বৃত্ত সকলেরই মনোযোগসহকারে পাঠ করা উচিত। এই জীবন-বৃত্তের প্রতি ঘটনায় গভীর উপদেশ পাওয়া যায়। রামকমলের চারি পুত্র-সন্তানের নাম হরিমোহন, প্যারীমোহন, বংশীধর ও মুরলী-ধর। ইঁহারা সকলেই সুশিক্ষিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিমোহন জয়পুরের মহারাজের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বিশিষ্ট দক্ষতা-সহকারে ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেষ্টা কেশব-চন্দ্র সেন রামকমলের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহনের তনয়। এক্ষণে দেওয়ান রামকমল সেনের বংশধরগণ কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আপনাদের দক্ষতার পরিচয় দিতেছেন।

বৈদেশিক পর-হিতৈষী

ডেবিড হেয়ার।

যখন ইংরেজ-শাসন আমাদের দেশে ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া উঠে, উচ্চতর ইংরেজী শিক্ষার অভাবে যখন আমাদের দেশীয় লোকের নানারূপ অসুবিধা হইতে থাকে, ইংরেজগণ কেবল অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এদেশে আসিতেন এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই যখন স্বদেশে যাইয়া এদেশকে একেবারে ভুলিয়া যাইতেন, তখন একজন প্রকৃত হিতৈষী ইংলণ্ড হইতে আমাদের দেশে আগমন করেন, এবং আমাদের দেশকে আপনার দেশ ভাবিয়া আমাদিগকে রোগে ঔষধ, শোকে সান্ত্বনা দিয়া, আমাদের হৃদয় শান্তির অমৃত-প্রবাহে অভিষিক্ত করেন। এই বৈদেশিক পর-হিতৈষীর নাম ডেবিড হেয়ার।

ডেবিড হেয়ারের পিতা লণ্ডন নগরে ঘড়ি প্রস্তুত ও মেরামত করিতেন। তিনি স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী এবর্ডিন নগরের একটি কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। এইস্থানে খ্রীঃ ১৭৭৫ অব্দে ডেবিড হেয়ারের জন্ম হয়। ডেবিড তাঁর সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। তাঁহার আর তিন ভ্রাতার নাম, জোসেফ, আলেকজেণ্ডার ও জন। পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ডেবিড কলিকাতায় আগমন করেন। ডেবিড হেয়ারের আসিবার পর তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা আলেকজেণ্ডার এখানে আইসেন। কিছু দিন অবস্থিতির পর আলেকজেণ্ডারের পরলোক-প্রাপ্তি হয়। জনও এদেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল এখানে অবস্থান করেন নাই, ইচ্ছানুরূপ অর্থসংগ্রহ পূর্ব্বক স্বদেশে গমন করেন।

হেয়ার সাহেব কলিকাতায় কিছুকাল ঘড়ির কাজ করিয়া অর্থ

ডেবিড হেয়ার।
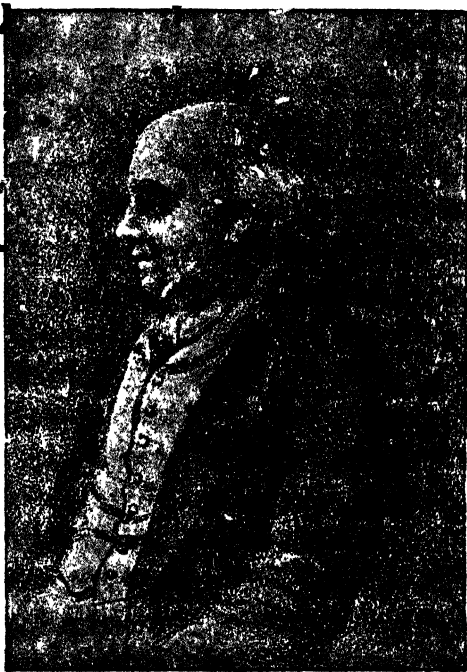
জন্ম—খৃঃ ১৭৭৫ অব্দ।

মৃত্যু—খৃঃ ১৮৪২ অব্দ, ১লা জুন।

জন্মস্থান—স্কটলণ্ডের অন্তর্গত এবর্ডিন নগর।

সঞ্চয় পূর্ব্বক তাঁহার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু গ্রে সাহেবকে আপনার কার্য্যভার সমর্পণ করেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতার ন্যায় এখানে কেবল অর্থ উপার্জ্জনের মানসে আগমন করেন নাই। এই দেশেই আপনার জীবিত-কাল অতিবাহিত করিবার তাঁহার বলবতী ইচ্ছা হয়। এদেশে তাঁহার কোনরূপ পার্থিব বন্ধন ছিল না। তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতাদের পরিবারবর্গ ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেন। কিন্তু অনুপম উদারতা ও নিঃস্বার্থ-হিতৈষিতা তাঁহাকে এদেশে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। তিনি এদেশের অধিবাসীদিগকে আপনার ভ্রাতার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন, এবং তাহাদের উপকারের জন্য যথাশক্তি পরিশ্রম ও যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হেয়ার সাহেব সম্ভ্রান্ত হিন্দুদিগের বাটীতে যাইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। যাহাতে পরস্পরের মধ্যে একতা ও সৌহার্দ্দ জন্মে, এবং উভয় সম্প্রদায় যাহাতে পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে, ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। তিনি অকুণ্ঠিতভাবে সম্ভ্রান্ত হিন্দুদিগের বাটীতে যাইতেন, সরল হৃদয়ে তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতেন, এবং সানন্দ অন্তঃকরণে নানাপ্রকার আমোদ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্প্রীত করিয়া তুলিতেন। এইরূপে প্রগাঢ় সহানুভূতি দেখাইয়া হেয়ার সাহেব সকলকেই আপনার আত্মীয় করিয়া তুলিলেন। কোনরূপ ক্রিয়াকাণ্ড অথবা প্রমোদকর ব্যাপার উপস্থিত হইলে, সকলেই হেয়ার সাহেবকে আদরের সহিত নিমন্ত্রণ করিত। হেয়ার সকলের বাটীতে যাইয়াই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন। বিদেশী ও বিধর্ম্মীর গৃহে যাইয়া আমোদ করিতেছেন বলিয়া, তিনি কখনও আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিতেন না, প্রত্যুত ইহাতে তাঁহার উদার ও সরল অন্তঃকরণে প্রীতির আবির্ভাব হইত।

এই সময়ে মহানগরী কলিকাতায় ভাল ইংরাজী অথবা বাঙ্গালা

পাঠশালা ছিল না। ছাত্রেরা সামান্যরূপ লিখন, পঠন ও গণিত অভ্যাস করিয়াই শিক্ষা সমাপ্ত করিত। অধ্যয়নের উপযোগী ভাল ভাল বাঙ্গালা গ্রন্থও এই সময়ে প্রচলিত ছিল না। সুতরাং উচ্চতর শিক্ষার অভাবে শিক্ষার্থীদিগের হৃদয় উচ্চতরভাবে সম্প্রসারিত হইত না। হেয়ার সাহেব প্রথমে এই অভাব বুঝিতে পারিলেন। কিসে এ দেশের যুবকগণ উচ্চতর শিক্ষা পাইয়া, বহুদর্শী ও বহুগুণান্বিত হইয়া উঠে, ইহাই এক্ষণে তাঁহার প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইল। প্রস্তাবিত সময়ে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের সমাজে বিজ্ঞ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। হেয়ার সাহেব প্রথমে ইঁহাদের সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ করেন। আমাদের দেশের প্রতি সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি সার্ হাইড ইষ্ট সাহেবের বিশিষ্ট মমতা ও স্নেহ ছিল। হেয়ার সাহেব অতঃপর তাঁহার নিকট যাইয়াও একটি প্রধান বিদ্যালয় স্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে আমাদের দেশের লোকের কিরূপ মত জানিবার জন্য প্রধান বিচারপতি বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে সকলের নিকট পাঠাইয়া দেন। বৈদ্যনাথ প্রধান বিচারপতির অনুরোধে সমাজের সমস্ত ব্যক্তির নিকটে এ বিষয়ের প্রস্তাব করিলে সকলেই তাহাতে আহ্লাদসহকারে সম্মতি প্রকাশ করেন। বৈদ্যনাথ প্রধান বিচারপতির নিকট যাইয়া সকলের সম্মতি জানাইলেন। প্রধান বিচারপতির মুখ উৎফুল্ল হইল। অবিলম্বে একটি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। সমুদয় প্রস্তুত হইয়াছে, এমন সময়ে অভীষ্ট কার্য্যের একটি বিঘ্ন উপস্থিত হইল। এই সময়ে রাজা রামমোহন রায় পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করাতে হিন্দু-সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; এক্ষণে রামমোহন রায় প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের একজন অধ্যক্ষ হইবেন

শুনিয়া, পৌত্তলিক হিন্দুগণ পূর্ব্ব অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিতে অসম্মত হইলেন। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিলেন, যাবৎ বিদ্যালয়ের সহিত রামমোহন রায়ের সম্বন্ধ থাকিবে, তাবৎ তাঁহারা কোনরূপ আনুকূল্য করিবেন না। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ম্রিয়মাণ হইলেন, প্রধান বিচারপতির হৃদয়ে আঘাত লাগিল। উপস্থিত বিষয়ে কি করিতে হইবে, তাঁহারা কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। যে সন্তোষ ও প্রীতির তরঙ্গে তাঁহারা এতক্ষণ দোলায়মান হইতেছিলেন, তাহা অপগত হইল। প্রধান বিচারপতি ও বৈদ্যনাথ নিরাশার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে এক মনস্বী ব্যক্তি কার্য্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। ডেবিড হেয়ার কোন কার্য্য অসম্পন্ন রাখিবার লোক ছিলেন না। উপস্থিত বিষয়ে ঐরূপ বিঘ্ন দেখিয়া তিনি কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন না। যে অনুরাগ, সাহস ও উদ্যম তাঁহার প্রকৃতিকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল, তাহা অপসারিত হইল না। হেয়ার অকুতোভয়ে কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তিনি রামমোহন রায়ের স্বভাব বিলক্ষণ-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, সুতরাং সাহস-সহকারে তাঁহাকে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। রাম-মোহন রায় স্বভাবসিদ্ধ উদারতা-গুণে এই অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন না। তিনি সাধারণের উপকারের জন্য আপনার গৌরব ও সম্মান অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া সাধারণের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের সহিত সংস্রব ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। অবিলম্বে প্রচারিত হইল, রামমোহন রায় বিদ্যালয়ের সহিত কোনরূপ সংস্রব রাখিবেন না। হিন্দুগণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন, এবং প্রধান বিচারপতির আলয়ে যাইয়া প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান পূর্ব্বক বিদ্যালয় স্থাপনের অভিপ্রায় জানাইলেন।

প্রধান বিচারপতি ডেবিড হেয়ারের এই সাহস ও উদ্যম দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। অবিলম্বে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইল। আমাদের ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণ পর্য্যন্ত ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা সংগঠিত হয়। ১৮১৬ অব্দের ১৭ই আগষ্ট বিদ্যালয়ের কার্য্য-প্রণালীর নির্দ্ধারণ জন্য ঐ সভার অধিবেশন হয়। হেয়ার সাহেব ঐ সভার সভ্য ছিলেন না, তথাপি নিয়মিত সময়ে সভায় আসিয়া সৎপরামর্শ দিয়া, আপনার কার্য্য-তৎপরতা দেখাইতে লাগিলেন। তিনি কেবল এইরূপ পরামর্শ দিয়াই নিরস্ত হইলেন না। বিদ্যালয়ের জন্য ক্রমে তাঁহার অসাধারণ যত্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। হেয়ার সাহেবের অসামান্য উৎসাহ, যত্ন ও পরিশ্রমে খ্রীঃ ১৮১৭ অব্দের ২০শে জানুয়ারি কলিকাতায় মহাবিদ্যালয় (হিন্দুকলেজ) স্থাপিত হইল।

স্বতন্ত্র বাটীর অভাবে হিন্দুকলেজের কার্য্য প্রথমে কলিকাতা গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে আরম্ভ হইল। হেয়ার সাহেব প্রতিদিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া উহার উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পটলডাঙ্গায় তাঁহার কিছু ভূ-সম্পত্তি ছিল, বিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মাণ জন্য উহার কিয়দংশ তিনি আহ্লাদসহকারে দান করিলেন। ঐ স্থলে সংস্কৃত ও হিন্দুকলেজের বাটী নির্ম্মিত হইল। *

---

* হিন্দুকলেজ দীর্ঘকাল গরাণহাটায় থাকে নাই। ইহা পরে চিৎপুরে রূপচরণ রায়ের বাটীতে যায়। ঐ স্থান হইতে ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাটীতে আইসে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার উইলসন সাহেবের যত্নে হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজের জন্য নূতন বাটী নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত হয়। ১৮২৪ অব্দের ২৫এ জানুয়ারি নূতন বাটীর ভিত্তি স্থাপিত হয়। তৎপরবর্ত্তী বৎসর নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়া উঠে। ঐ নূতন বাটীর মধ্যভাগে সংস্কৃত কলেজ এবং দুই পার্শ্বে হিন্দু কলেজের কার্য্য হইতে থাকে।

হেয়ার সাহেব পরে হিন্দু বিদ্যালয়ের অবৈতনিক কার্য্য-নির্ব্বাহক সভ্যের পদ গ্রহণ করিলেন।

যে বৎসর হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বৎসর হেয়ার সাহেব কলিকাতায় "স্কুলবুক্ সোসাইটি" নামে একটি সভা স্থাপন করেন। বিদ্যালয়ের উপযোগী পুস্তকসকল ইংরেজী ও এতদ্দেশীয় ভাষায় প্রণয়ন পূর্ব্বক অল্প অথবা বিনামূল্যে প্রচার করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সভায় যে কয়েকজন সভ্য ছিলেন, তাঁহারা নূতন বিদ্যালয়ের স্থাপন ও বর্ত্তমান পাঠশালা সমূহের সংস্করণ জন্য বিশেষ চেষ্টান্বিত হন। এই উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তী বৎসর "স্কুল সোসাইটি" নামে আর একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। হেয়ার সাহেব ও রাজা রাধাকান্ত দেব ঐ সভার সম্পাদকের কার্য্য-ভার গ্রহণ করেন। সভা তিন শাখায় বিভক্ত হয়। এক শাখা বিদ্যালয়সমূহের সংস্থাপনের ভার, অপর শাখা পাঠশালা সমূহের পরিদর্শনের ভার এবং তৃতীয় শাখা উচ্চতর শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেন। প্রস্তাবিত সভার তত্ত্বাবধানে কলিকাতার স্থানে স্থানে কয়েকটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল পাঠশালার একটিতে আমাদের দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন।* পূর্ব্বোক্ত স্কুল সোসাইটির যত্নে এই শেষোক্ত পাঠশালার নিকটে এবং পটলডাঙ্গায় দুইটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় †। যে সকল ছাত্র পাঠশালায় থাকিয়া ব্যুৎপত্তি লাভ করিত, তাহারা ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক উচ্চতর শিক্ষায় অভিনিবিষ্ট হইত। হেয়ার সাহেব যথাসময়ে এই সকল বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন।

যাহাতে এ দেশের লোকে বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপন্ন হয়, এবং বাঙ্গালা

---

* এই স্কুল আড়পুলিতে ছিল।

† স্কুল সোসাইটীর এই স্কুল এক্ষণে "হেয়ার স্কুল" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

ভাষা যাহাতে সম্মার্জ্জিত হইয়া উঠে, হেয়ার সাহেবের সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ ও যত্ন ছিল। সমস্ত কলিকাতা চারিখণ্ডে বিভাগ করা হইয়াছিল; এক এক জন প্রতিখণ্ডের পাঠশালাগুলি তত্ত্বাবধান করিতেন *। ইঁহারা আপন আপন বাটীতে বৎসরে তিনবার পরিদর্শনাধীন পাঠশালার ছাত্রদের পরীক্ষা লইতেন। সমস্ত পাঠশালার ছাত্রদিগের বার্ষিক পরীক্ষা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাটীতে হইত। ইঁহাদের সকলের নিকটেই স্কুলবুক সোসাইটির প্রকাশিত পাঠশালার পাঠ্য পুস্তক থাকিত। প্রয়োজন হইলেই ঐ সকল পুস্তক ছাত্রদিগকে দেওয়া যাইত। উপযুক্ত ছাত্রদিগের কেহ ইংরেজী বিদ্যালয়ে, কেহ বা হিন্দুকলেজে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিত। গুরুমহাশয়গণও গুণানুসারে পুরস্কৃত হইতেন। এতদ্ব্যতীত যে সকল ছাত্র ইংরেজী স্কুলে প্রবেশ করিত, তাহারা প্রাতে ও বৈকালে পাঠশালায় আসিয়া বাঙ্গালা ভাষা শিখিত। এইরূপে মাতৃ-ভাষার প্রতি বাঙ্গালিগণের শ্রদ্ধা বৃদ্ধিত হইতে লাগিল, এবং এইরূপে হেয়ার সাহেবের বন্দোবস্তের গুণে আমাদের দেশের ছাত্রগণ বাঙ্গালা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই কৃতবিদ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

খ্রীঃ ১৮৩০ অব্দে হিন্দু ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সমবেত হইয়া হেয়ার সাহেবকে একখানি অভিনন্দন পত্র সমর্পণ করেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ

---

* এই চারিজন পরিদর্শকের মধ্যে বাবু দুর্গাচরণ দত্ত ৩০ টি পাঠশালার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। এই সকল পাঠশালায় প্রায় ৯০০ ছাত্র পড়িত। রামচন্দ্র ঘোষকে ৪০টি স্কুল দেওয়া হয়। ঐ সকল স্কুলে ৮৯৬ জন শিক্ষার্থী ছিল। বাবু উমানন্দ ঠাকুর ৩৬টি পাঠশালা গ্রহণ করেন, উহাতে প্রায় ৬০০ ছাত্র ছিল। ৫৭টি পাঠশালার পরিদর্শনের ভার রাজা রাধাকান্ত দেবের হস্তে সমর্পিত হয়। উহাতে ১,১৩৬ জন ছাত্র বিদ্যাভ্যাস করিত।

প্রভৃতির যত্নে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। অভিনন্দন-পত্র সমর্পণ সময়ে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় একটি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়া হেয়ার সাহেবকে কহেন, "আপনি আমাদের পরমারাধ্য মাতা; আমাদিগকে স্তন্য দিয়া বর্দ্ধিত করিতেছেন।" সরল-হৃদয় ছাত্রদিগকে এইরূপ সরল-ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে দেখিয়া হেয়ার সাহেবের কোমল হৃদয় বিগলিত হইল, তিনি দণ্ডায়মান হইয়া স্নেহমধুর-স্বরে কহিলেন :—

"আমি ভারতবর্ষে আসিয়া দেখিলাম, এ স্থানে নানাবিধ সামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে; ভূমি প্রচুর-শস্যশালিনী, অধিবাসিগণ পরিশ্রমী, উৎকৃষ্ট গুণান্বিত এবং পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজনপদের অধিবাসীদিগের সমকক্ষ, কিন্তু বহুশত বৎসরের দৌরাত্ম্য ও কুশাসনে সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার বিলুপ্ত হইয়াছে, এবং দেশ অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে এই দেশের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য এতদ্দেশীয়-দিগের ইউরোপীয় শাস্ত্রের অনুশীলন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমি এই দেশে যে বীজ বপন করিয়াছি, তাহা হইতে একটী মহাবৃক্ষ সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই মহাবৃক্ষের ফল এক্ষণে আমার চারিদিকে প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে।" অভিনন্দন-পত্র প্রদানের পর ছাত্রেরা চাঁদা করিয়া হেয়ার সাহেবের একখানি প্রতিকৃতি চিত্রিত করেন। এক্ষণে এই প্রতিকৃতি হেয়ার স্কুলে রহিয়াছে।

হেয়ার সাহেব এইরূপে স্বহস্ত-রোপিত মহাবৃক্ষের ফল দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন, এইরূপে তাঁহার স্নেহাস্পদ ছাত্রগণ সরলহৃদয়ে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। হেয়ার স্বীয় পবিত্র জীবনের এক সাধনায় কৃতকার্য্য হইলেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা উৎকট সাধনা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনি প্রগাঢ় পরিশ্রম ও যত্নপূর্ব্বক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, অকাতরে অর্থ

ব্যয় করিয়া বাঙ্গালীদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, পিতার ন্যায় প্রীতি ও মাতার ন্যায় স্নেহ দেখাইয়া, আপনার দেবপ্রকৃতির পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালীদিগের জন্য কোনরূপ ব্যবসায় ক্ষেত্র প্রসারিত করিতে পারেন নাই। মহামতি হেয়ার এক্ষণে এই সাধনায় সিদ্ধ হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালিগণ যাহাতে ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহার জন্য কোনরূপ শিক্ষালয় স্থাপন করিতে তিনি বিশেষ আগ্রহান্বিত হইলেন। এই সময়ে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষের প্রধান শাসনকর্ত্তা ছিলেন। হেয়ার সাহেব প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। প্রস্তাবিত সময়ে এতদ্দেশীয়দিগকে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য একটি কলেজ স্থাপন করিবার প্রস্তাব হয়। বেণ্টিঙ্ক এদেশের একজন প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন, হেয়ার সাহেব তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া, মেডিকেল কলেজ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এতদ্দেশীয়েরা মৃতদেহ স্পর্শ বা ব্যবচ্ছেদ করিবে কিনা, তদ্বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হইলেন; চিরন্তন ধর্ম্মহানির আশঙ্কা করিয়া কেহ হিন্দুদিগের নিকটে এ বিষয়ের প্রস্তাব করিতেও সাহসী হইলেন না। কিন্তু হেয়ার সাহেবের চেষ্টা ও আগ্রহ অমূলক সন্দেহ বা সামান্য আশঙ্কায় তিরোহিত হইল না। একদিন হেয়ার সাহেব একান্তে এই বিষয় ভাবিতেছেন, এমন সময়ে মধুসূদন গুপ্ত * তথায় উপস্থিত হইলেন। হেয়ার সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"মধু! শবব্যবচ্ছেদের সম্বন্ধে হিন্দুদের পক্ষ হইতে কি কোন আপত্তি হইবে?

মধুসূদন গম্ভীরভাবে বিলক্ষণ দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন,

---

* ইনি সংস্কৃত কলেজের চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।

"আপত্তি উপস্থিত করিলে পণ্ডিতেরা বিচারে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিবেন।'

হেয়ারের মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইল, লোচনদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া হৃদয়ের অনির্ব্বচনীয় সন্তোষ বাহির করিয়া দিতে লাগিল। হেয়ার প্রফুল্লমুখে কহিলেন,

"আমি কল্যই লর্ড বেণ্টিঙ্কের নিকটে যাইয়া এ বিষয়ে বলিব।"

খ্রীঃ ১৮৩৫ অব্দে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইল। মধুসূদন গুপ্ত প্রথমে শবব্যবচ্ছেদ করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ হইলেন। তাঁহার প্রতিকৃতি মেডিকেল কলেজের গৃহ অলঙ্কৃত করিল। হেয়ারের উত্তেজনায় অনেক ছাত্র হিন্দুকলেজ ও তাঁহার নিজের স্কুল হইতে মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইল। হেয়ার এই কলেজের কার্য্য-সম্পাদক হইলেন। তিনি প্রতিদিন অন্যান্য বিদ্যালয়ের ন্যায় মেডিকেল কলেজেও আসিয়া উহার তত্ত্বাবধান করিতেন। এতদ্ব্যতীত চিকিৎসালয়ে যে সমস্ত রোগী থাকিত, যথানিয়মে তাহাদের শুশ্রূষা করিতেও ত্রুটি করিতেন না। কিরূপে রোগীরা আরামে থাকিতে পারে, কিরূপে তাহাদের সমুদয় যন্ত্রণার নিবারণ হয়, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। হেয়ার সাহেব এই সকল কার্য্যে কিছুমাত্র বিচলিত বা অসন্তুষ্ট হইতেন না। তিনি পরের উপকারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, পরের উপকার সাধিত হইলেই জীবনের সার্থকতা অনুভব করিতেন।

হেয়ার মেডিকেল কলেজের জন্য যে অকাতরে পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন, তাহা সকলের হৃদয়েই গাঢ়রূপে অঙ্কিত ছিল। কলেজ স্থাপিত হওয়ার কিছুকাল পরে ডাক্তার ব্রামলী সাহেব একটি বক্তৃতায় হেয়ার সাহেবের ঐ সমস্ত গুণের উল্লেখ করেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছিলেন,—

"হেয়ার সাহেবের উৎসাহ ও সাহায্যে কলেজ অনেক পরিমাণে

উপকৃত হইয়াছে। কলেজ স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে তিনি স্বভাবসিদ্ধ উদারতা ও কার্য্য-তৎপরতা গুণে যে সকল পরামর্শ দিয়াছেন, তাহাতে অনেক উপকার দর্শিয়াছে। অধ্যাপনার সময়ে তিনি উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমার এক এক সময়ে বোধ হইয়াছে যে কলেজ রক্ষা করা কঠিন; কিন্তু মহামতি হেয়ার কিছুতেই বিচলিত হন নাই। তিনি প্রগাঢ় পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক কলেজকে সমুদয় বিঘ্নবিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ফলে হেয়ার সাহেবের সাহায্য ব্যতীত কখনই এই চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপন করা যাইত না। এজন্য তাঁহার নিকটে আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।"

ডেবিড হেয়ার স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সকলের এইরূপ শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছিলেন, সকলেই সরলভাবে তাঁহার প্রতি এইরূপ সম্মান ও আদর প্রদর্শন পূর্ব্বক তদীয় অসাধারণ গুণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে আমাদের সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন হইতে থাকে। বাঙ্গালী, ইংরেজ সকলেই এই উদ্দেশ্যে একত্র সম্মিলিত হন। খ্রীঃ ১৮২০ অব্দের পূর্ব্বে কলিকাতায় "জুবিনাইল সোসাইটি" নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা স্ত্রী-শিক্ষার ভার গ্রহণ পূর্ব্বক কলিকাতার শ্যামবাজার, জানবাজার ও ইটালীতে এক একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রাজা রাধাকান্ত দেব স্ত্রী-শিক্ষার একজন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি এই সময়ে "স্ত্রী-শিক্ষা বিধায়ক" নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া উক্ত সভায় দান করেন। ঐ পুস্তকে প্রদর্শিত হয় যে, নারী-জাতিকে শিক্ষা দেওয়া উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের চিরন্তন ধর্ম্ম। প্রাচীন সময়ে অনেক নারী সুশিক্ষিতা ছিলেন। এক্ষণে স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলে আমাদের দেশের বিস্তর মঙ্গল হইবে। সভা

ঐ পুস্তক মুদ্রিত করিবার সঙ্কল্প করেন। স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতির জন্য সভার চেষ্টা নিষ্ফল হয় নাই। ক্রমে স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি হইতে থাকে। হেয়ার সাহেব নিয়মিতরূপে অর্থ দিয়া সভার সাহায্য করিতেন। বালকদিগের শিক্ষাকার্য্যের ন্যায় বালিকাদিগের শিক্ষা-কার্য্যের প্রতিও তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল।

হেয়ার কেবল শিক্ষা-কার্য্যের শৃঙ্খলা-বিধানেই সময়ক্ষেপ করিতেন না। সে সময়ে আমাদের দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত, তৎসমুদয়েই তিনি লিপ্ত থাকিতেন। প্রসিদ্ধ মিশনরী কেরি ও মার্শমান সাহেব একটি সভা স্থাপন পূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করেন, ডেবিড হেয়ার ঐ সভায় নিয়মিতরূপে চাঁদা দিতেন। যাহাতে সাধারণে স্বাধীনভাবে সংবাদপত্রে লিখিতে পারে, তজ্জন্যও তিনি অনেক চেষ্টা করেন। কুলীদিগকে তাহাদের বিনা সম্মতিতে অনেক দূরদেশে পাঠান হইত। এরূপ অনেকগুলি কুলী মরিসস্ দ্বীপে যাইবার জন্য কলিকাতায় আবদ্ধ ছিল; হেয়ার ঐ বিষয় অবগত হইয়া পুলিসের সাহায্যে তাহাদিগকে বিমুক্ত করেন।

ডেবিড হেয়ার বলিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও মিতাচারী ছিলেন, তাঁহার কিছু-মাত্র বিলাস-প্রিয়তা ছিল না; সামান্য অশনবসনেই তিনি পরিতৃপ্ত থাকিতেন। তিনি আমাদের দেশের সন্দেশ, চন্দ্রপুলি, ডাবের জল ও মদ্‌গুর মৎস্য বড় ভাল বাসিতেন। আপনার সুখসমৃদ্ধির দিকে তাঁহার বড় দৃষ্টি ছিল না। পরসুখে তাঁহার সুখ ও পরদুঃখে তাঁহার দুঃখ হইত। তিনি সর্ব্বদা প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের মিতাহারের প্রশংসা করিতেন। হেয়ার সাহেব নিজে যে সকল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া-ছিলেন, তৎসমুদয়ই আমাদের দেশের উপকারের নিমিত্ত ব্যয় করেন। তিনি যে ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, অর্থের অনটন হইলেও তাহা হইতে কখন স্খলিত হইতেন না; তাঁহার একজন হিতৈষী বন্ধু চীন

দেশে ব্যবসায় করিতেন, তিনি এই বন্ধুর নিকট হইতে অর্থ আনিয়া আমাদের উপকারার্থে ব্যয় করেন। হিন্দুকলেজের দক্ষিণে ও পশ্চিমে তাঁহার অনেক ভূমি ছিল, আমাদের জন্য তিনি এই সকল ভূমি বিক্রয় করিতেও কাতর হন নাই। এইরূপ হিতৈষিতায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল, এইরূপ হিতৈষিতা তাঁহাকে পবিত্র জীবনের মহত্তর কার্য্যসাধনে নিযুক্ত রাখিয়াছিল।

হেয়ার প্রতিদিন বেলা দশটার সময়ে পাল্কিতে স্কুল ও কলেজ দেখিতে আসিতেন। তাঁহার পাল্কি একটি ক্ষুদ্র ঔষধালয় ছিল। উহাতে সমুদয় প্রয়োজনীয় ঔষধই সজ্জিত থাকিত। তিনি স্কুলে আসিয়া প্রথমে উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির বইখানি দেখিতেন। যে যে বালক অনুপস্থিত থাকিত, অবিলম্বে তাহাদের অনুসন্ধানে বহির্গত হইতেন। কেহ বাড়ীতে পীড়িত থাকিলে যথাযোগ্য ঔষধ দিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেন। কাহাকেও বাড়ীতে না পাওয়া গেলে সকল স্থানে অনুসন্ধান করিয়া আনিতেন এবং বিবিধ সদুপদেশ দিয়া তাহাকে সুব্যবস্থিত করিয়া তুলিতেন। এইরূপে তাঁহার অসাধারণ বাৎসল্যে পীড়িতগণ চিকিৎসিত ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির বালকগণ সুশৃঙ্খল হইত। তিনি ছাত্রদের অমিতাচার বা দুর্ব্বিনীত ব্যবহার দেখিতে ভাল বাসিতেন না। তাঁহার গুণে সে সময়ের বালকদের ঐ সমস্ত দোষ তিরোহিত হইয়া আইসে। তিনি কখনও কোন অন্যায় ব্যবহারের বিবরণ শুনিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করিতেন। একদা তিনি শুনিতে পাইলেন, কোন ধনীর একটি পুত্র একখণ্ড কাগজে কোন বালকের কুৎসা লিখিয়া কলেজের গৃহের থামে লাগাইয়া দিয়াছে। হেয়ার রাত্রিতে ঐ সংবাদ পাইলেন। সংবাদ পাইবামাত্র সেই রাত্রিতেই লণ্ঠন হস্তে করিয়া কলেজে যাইয়া কাগজখানি ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

যাহাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি ধনিসন্তানদিগের

সংসর্গে থাকিয়া দুষ্ট-স্বভাব না হয়, তৎপ্রতি হেয়ার সাহেবের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি অনেক বালককে অসৎপথ হইতে নিবারিত করেন। যাহারা অসন্মার্গগামী ছিল, অথবা যাহাদের প্রতি কোনরূপ সন্দেহ জন্মিত, হেয়ার সাহেব সর্ব্বদা তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি হঠাৎ তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইতেন, বাড়ীতে না পাওয়া গেলে, যেখানে থাকুক, অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে আপনার নিকটে আনিতেন। বালকদের প্রতি তাঁহার পুত্রাধিক স্নেহ ছিল। যে সকল বালক অর্থাভাবে পড়িতে পারিত না, তিনি তাহাদিগকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন, যাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থানে অসমর্থ, তাহাদিগকে অন্নবস্ত্র দিয়া বিদ্যাভ্যাস করাইতেন। পটলডাঙ্গার স্কুল সোসাইটির স্কুলের ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তকাদির ব্যয় তিনি আপনা হইতে দিতেন। যাহারা সুশিক্ষিত হইয়া বিদ্যালয় হইতে বাহির হইত, তিনি তাহাদিগকে কর্ম্ম দিয়া সংসারী করিয়া তুলিতেন। বালকদিগের পীড়ার সংবাদ যথাসময়ে না পাইলে তাঁহার কোমল হৃদয়ে নিদারুণ কষ্টের সঞ্চার হইত। যথাসময়ে ও যথানিয়মে তাহাদের শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিলেই তিনি আপনাকে সুখী জ্ঞান করিতেন। আমাদের প্রতি তাঁহার মমতা ও স্নেহ এত প্রবল ছিল যে, তিনি শোক-দুঃখে পীড়িত হইলেও সর্ব্বদা সমাহিত থাকিয়া আপনার পবিত্র ব্রত পালন করিতেন। স্বদেশে তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু হয়, এই সংবাদ তাঁহার নিকটে আসিলে তিনি গলদশ্রুলোচনে একটি ছাত্রকে কহিলেন, "তাঁহার প্রিয়তম ভ্রাতা ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন।" এই কথা বলিবামাত্র তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি বাষ্পনিরুদ্ধকণ্ঠে কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া ছাত্রের হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত লাগিল, কিন্তু হেয়ার সাহেব স্বাভাবিক আত্মসংযম-বলে প্রকৃতিস্থ

হইলেন। ভ্রাতৃবিয়োগ-শেল তাঁহার হৃদয়ে গাঢ়রূপে বিদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি তিনি সর্ব্বদা সমাহিত-চিত্ত থাকিতেন, ছাত্রেরা বিরক্ত করিলেও হৃদয়ের কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিতেন না।

হেয়ার প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ণ ৮টার সময় গাত্রোত্থান করিতেন। রবিবার কি কোন পর্ব্বাহে আমাদের দেশের লোকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহ দর্শকশ্রেণীতে পরিপূর্ণ থাকিত। অল্পবয়স্ক বালকেরা অম্লানভাবে সহাস্যবদনে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। তিনি তাহাদিগকে পুতুল প্রভৃতি ক্রীড়ার সামগ্রী ও সচিত্র পুস্তক দিয়া আমোদিত করিতেন। তাঁহার গৃহ পবিত্র-স্বভাব বালকদিগের ক্রীড়া-ভূমি ছিল। শিশুর অমৃতময় কমনীয় কান্তি, যুবকের স্ফূর্ত্তিশীল তেজস্বিনী লক্ষ্মী, বৃদ্ধের প্রশান্তময় সৌম্যভাব, তাঁহার গৃহের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য বিকাশ করিত। এইরূপে কোমল প্রাভাতিক লক্ষ্মী, তেজঃপূর্ণ মধ্যাহ্ন-শ্রী ও শান্তিময়ী সায়ন্তন শোভায় পুণ্যশীল ডেবিড হেয়ার পুলকিত থাকিতেন, এইরূপে তাঁহার আবাসভূমি নিরন্তর স্বর্গীয়ভাবে পরিপূর্ণ রহিত।

ছাত্রদিগকে পরিষ্কৃত রাখিতে হেয়ার সাহেবের বিশেষ যত্ন ছিল। তিনি প্রতিদিন স্কুলের ছুটীর সময়ে একখানি তোয়ালে হস্তে করিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন, এবং ঐ তোয়ালে দ্বারা ছাত্রদের হস্তপদাদি পরিষ্কার করিয়া দিতেন। যে সকল ছাত্র অপরিষ্কৃত থাকিত, তাহারা এইরূপে পরিচ্ছন্ন হইতে অভ্যাস করিত। হেয়ার যে সময়ে ও যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, এতদ্দেশীয়দিগের বিপদের সংবাদ পাইলে কখন সুস্থির থাকিতেন না। একদিন অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টি ও তৎসঙ্গে প্রচণ্ড ঝড় হইতেছিল, সন্ধ্যার পর ঝটিকার বেগ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, বাগবাজারের একটি ছাত্র জ্বরে সাতিশয় পীড়িত হইয়াছে। সংবাদ পাইবামাত্র হেয়ার উদ্বিগ্ন-

চিত্তে গাত্রোত্থান করিলেন। সেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও প্রবল ঝটিকার মধ্যে একখানি সামান্য গাড়ি ভাড়া করিয়া তিনি বাগবাজারে উপনীত হইলেন, এবং তথায় দুই ঘণ্টাকাল পীড়িতের শুশ্রূষাদি করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে হেয়ার বিলক্ষণ বলশালী ছিলেন। তিনি কেবল দৈহিক বিক্রমের উপর নির্ভর করিয়া অনেক অসম-সাহসিক কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইতেন। একদা হেয়ার স্কুলে বসিয়া আছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, একজন গোরা কোন ছাত্রের গাড়ী ভাঙ্গিয়া প্রস্থান করিয়াছে। সমীপবর্ত্তী লোকে কেহই এই গোরাকে ধরিতে পারিল না, কিন্তু হেয়ার তীরবেগে যাইয়া তাহাকে ধরিয়া থানায় পাঠাইয়া দিলেন। অন্য সময়ে কয়েকজন তস্কর একটি বালকের আভরণ অপহরণ করিয়া পলাইতেছিল, হেয়ার উহা জানিতে পারিয়া ধৃত করিবার জন্য তাহাদের অনুসরণ করেন। ইহাতে তস্করেরা তাঁহার মস্তকে গুরুতর আঘাত করে। হেয়ার কিছুদিন এই জন্য শয্যাশায়ী ছিলেন।

হেয়ার পরের ক্লেশ অথবা অসুবিধা দেখিতে পারিতেন না। একদা তিনি সন্ধ্যার সময় বাটীতে বসিয়া আছেন, অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টি হইতেছে; এমন সময়ে চন্দ্রশেখর দেব * ভিজিতে ভিজিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। হেয়ার উহা দেখিয়া শশব্যস্তে আপনার টেবিলের কাপড় তাঁহাকে পরিতে দিয়া তাঁহার আর্দ্র বস্ত্র নিজ হাতে নিংড়াইয়া শুকাইতে দিলেন। অধিক রাত্রিতে বৃষ্টি ধরিয়া গেল। হেয়ার সন্দেশ আনাইয়া চন্দ্রশেখরকে খাইতে দিলেন। পরে স্বয়ং একগাছি সুদৃঢ় যষ্টি ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে রাখিয়া আসিলেন।

---

* ইনি একজন বিখ্যাত ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন, আইনে ইঁহার পারদর্শিতা ছিল। সম্প্রতি ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

দুর্গোৎসবের সময়ে হেয়ার নিঃস্ব বালক এবং তাহাদের মাতা ও ভগিনীদিগকে কাপড় দিতেন। তিনি সমুদয় দরিদ্র ছাত্রে এবং তাহাদের দুঃখিনী জননী প্রভৃতির অন্নদাতা ও মঙ্গল-বিধাতা ছিলেন। কাহারও কোনরূপ কষ্ট দেখিলে তাঁহার হৃদয়ে নিদারুণ কষ্টের সঞ্চার হইত। একদা একটি অনাথা নারী আপনার পুত্রকে স্কুলে ভর্ত্তি করিবার জন্য তাঁহার নিকটে আইসে; শ্রেণীতে স্থান না থাকাতে তিনি বিধবার মনোরথ পূর্ণ করিতে অসম্মত হন। দুঃখিনী ইহাতে নিরুত্তরা হইয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করে। কিন্তু নিরাশ্রয়া বিধবার রোদনধ্বনি হেয়ারের সহনীয় হইল না। দয়া ও উপচিকীর্ষা যেন হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে বিধবার অশ্রু মোচন করিতে সঙ্কেত করিল। নিকটে আমাদের দেশীয় একটি ভদ্র-সন্তান বসিয়াছিলেন। হেয়ার তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দুঃখিনী বিধবার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। অনাথা সন্তানের সহিত আবাস-কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া অবনতমস্তকে তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান হইল। তাহার মুখ হইতে একটী কথাও বহির্গত হইল না, কেবল কপোল বহিয়া বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। এই শোচনীয় দৃশ্যে হেয়ার সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। যে রূপেই হউক দুঃখিনী নারীর কষ্ট দূর করা এক্ষণে তাঁহার কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল। তিনি মুহূর্ত্ত কাল নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া পরে আন্তরিক স্নেহ-প্রকাশক মধুর স্বরে অনাথাকে কহিলেন, "ভদ্রে! রোদন করিও না; আমি অদ্য হইতে তোমার সন্তানের বিদ্যাশিক্ষার ভার লইলাম। যাবৎ তোমার সন্তান শিক্ষিত ও উপার্জ্জনক্ষম না হয়, তাবৎ আমি তোমাদের ভরণপোষণের জন্য মাসে মাসে চারিটি টাকা দিব।" অনাথা দয়াময় মহাপুরুষের এই বাক্যে পূর্ব্ববৎ অবিরলধারায় অশ্রুপাত করিতে লাগিল। ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা যেন তরলিত হইয়া অশ্রুরূপে দেখা দিল। হেয়ার আর

সে স্থানে থাকিলেন না। আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসাধ্বনি শুনিবার পূর্ব্বেই তিনি বিধবার নিকট বিদায় লইলেন।

কিন্তু করুণার এই মোহিনী মূর্ত্তি দীর্ঘকাল রোগ-শোক-দারিদ্র্য-পূর্ণ পার্থিব জগতে আপনার শান্তিময় ছায়া প্রসারিত রাখিতে পারিল না। দুরন্ত কাল আসিয়া উহার শত্রুতা সাধিল। হেয়ার ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হইলেন। ১৮৪২ অব্দের ৩১শে মে রাত্রিতে তাঁহার ওলাউঠা হয়। রোগের প্রারম্ভেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তিমকাল আসন্ন। এ জন্য তিনি পূর্ব্বেই একটি শবাধার প্রস্তুত করিয়া রাখিবার জন্য আপনার প্রধান পরিচারক দ্বারা গ্রে সাহেবের নিকটে বলিয়া পাঠান। পরদিন তিনি বেলেস্তারার জ্বালায় অবসন্ন হইয়া পড়েন ; ভয়ঙ্কর যাতনা সহিতে না পারিয়া চিকিৎসকদিগকে কাতরভাবে কহেন, "আমাকে শান্তভাবে শান্তিধামে যাইতে দাও।" কিছুক্ষণ পরে তাঁহার শরীর স্তম্ভিত হইয়া আসিল, চক্ষু নিমীলিত হইয়া পড়িল, করুণার মোহিনী মূর্ত্তি বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় ম্লান হইয়া গেল। পরহিতৈষী ডেবিড হেয়ার পরদেশের সন্তানদিগকে অপার দুঃখসাগরে ভাসাইয়া লোকান্তরিত হইলেন।

হেয়ারের মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র সকলেই গ্রে সাহেবের বাটীতে আসিতে লাগিল। সকলের মুখই বিবর্ণ, সকলেই করুণাময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতার বিয়োগ-নেত্রজলে প্লাবিত ; ক্রমে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইল। ডেবিড হেয়ারের দেহ স্বাভাবিক বেশে সজ্জিত হইয়া শবাধারে স্থাপিত ছিল। অল্পবয়স্ক বালকেরা সম্মুখে আসিয়া নীরবে দণ্ডায়মান হইল এবং নীরবে ও ভক্তিভাবে তাঁহার বদন স্পর্শ করিয়া বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। ঐ দিন আকাশমণ্ডল ঘোরতর মেঘে আচ্ছন্ন ছিল, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল ;

তথাপি সাধারণে তাঁহার শবের অনুগমন করিতে কিছুমাত্র কাতর হইল না। ১লা জুন সন্ধ্যার প্রাক্কালে হেয়ারের দেহ প্রথানিয়মে হিন্দু-কলেজের সম্মুখে সমাহিত হইল। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা প্রত্যেকে এক একটি টাকা চাঁদা দিয়া তাঁহার সমাধির উপর একটি সুদৃশ্য স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দিল। এই টাকা এত অধিক হইয়াছিল যে, শেষে কতক চাঁদা আদায় করা আবশ্যক হইল না।

আমাদের দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ডেবিড হেয়ারের স্মরণার্থ অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার একটি প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। এক্ষণে ঐ প্রতিমূর্ত্তি হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজের মধ্যভাগে অবস্থিত রহিয়াছে। প্রতি বৎসর হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর দিবসে একটি প্রকাশ্য সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। ঐ সভায় নানাবিষয়ে বক্তৃতা ও হেয়ার সাহেবের গুণকীর্ত্তন হয়। এতদ্ব্যতীত হেয়ার সাহেবের নামে একটি সমিতি আছে। ঐ সমিতির সাহায্যে মহিলাদিগের পাঠোপযোগী গ্রন্থাদি প্রচারিত হইয়া থাকে। এইরূপে আমাদের স্বদেশীয়গণ অনেক বিষয়ে হেয়ার সাহেবের পবিত্র নাম সংযোজিত করিয়া আপনাদের আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা দেখাইয়াছেন।

ডেবিড হেয়ারের চরিত্র অতি মহৎ ও পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ। অপরিসীম দয়া ও প্রগাঢ় সাধুতা তাঁহার পবিত্র জীবনে প্রতিভাসিত হইয়াছে। তিনি বিদেশে আসিয়া বিদেশী লোকের উপকারার্থ আপনার ধন ও জীবন সমস্তই উৎসর্গ করিয়াছিলেন। পরোপকার কার্য্যে কখনও তাঁহার কোনরূপ বিরাগ দেখা যায় নাই। তিনি বাঙ্গালীদিগকে যেমন পিতার ন্যায় সুশিক্ষা দিতেন, সেইরূপ মাতার ন্যায় স্নেহ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সম্প্রীত করিয়া তুলিতেন। স্বীয় জীবনের মহৎ ব্রত সাধনে তাঁহার হৃদয় কিছুতেই অবসন্ন হইত না,

এবং গভীর ন্যায়-বুদ্ধি কিছুতেই কোনরূপে কলুষিত হইয়া পড়িত না। তিনি জজের কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হইয়া সামান্যরূপ ব্যবসায় করিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যদি এই ব্যবসায়ে কিছু লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তৎসমুদয় পরের উপকারার্থে সমর্পণ করিবেন। কিন্তু শেষে তাঁহার সকল টাকা নষ্ট হয়, তিনি ঋণ-জালে জড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার একটি অর্দ্ধ-নির্ম্মিত বাটী ছিল, তিনি সেই বাটীটি কোনরূপে গাঁথিয়া উত্তমর্ণদিগকে দিয়া নিজে গ্রে সাহেবের বাটীতে আসিয়া থাকেন। তিনি আমাদের দেশের একজন প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। এই বন্ধুতা তাঁহার মানবী প্রকৃতিকে দেবভাবান্বিত এবং হৃদয়কে পবিত্র প্রেমে মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার যত্নে ও আগ্রহে আমাদের দেশে শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ়তর হইয়াছে। এই শিক্ষার বলে এক্ষণে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হইয়া সভ্য জগতের নিকটে গৌরব ও সম্মান লাভ করিতেছি। বৈদেশিক মহাপুরুষের এই পবিত্র হিতৈষিতা ও অনবদ্য প্রেম চিরকাল জীবলোককে মহার্থভাবের উপদেশ দিবে।

ডেবিড হেয়ার নিঃস্বার্থভাবে আমাদের দেশের যে সমস্ত উপকার করিয়াছেন, রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ সরলহৃদয়ে তৎসমুদয় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষা-বিভাগের বিজ্ঞাপনীতে হেয়ার সাহেবের সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

“হেয়ার ছোট আদালতের কার্য্যভার পাইয়া বিদ্যালয়ের প্রতি কিছুমাত্র ঔদাসীন্য দেখান নাই। তিনি প্রতিদিন স্কুলে যাইয়া সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। যে কোন উপায়ে হউক ছাত্র ও শিক্ষকদিগের উপকারসাধনই তাঁহার একমাত্র কার্য্য ছিল। তিনি ধীরভাবে ছাত্রদের বক্তব্য শুনিতেন, আমোদের সময় সন্তুষ্টচিত্তে তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইতেন, এবং সস্নেহে তাহাদিগকে নানা

প্রকার উপদেশ দিয়া সম্প্রীত করিয়া তুলিতেন। কেহ পীড়িত হইলে তিনি ঔষধ লইয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে যাইতেন, এবং কেহ কোন কার্য্যের জন্য লালায়িত হইলে যথাশক্তি তাহার সাহায্য করিতেন। এইরূপে সকল ছাত্রের প্রতিই তাঁহার পিতৃভাব ছিল; তিনি সকলের মঙ্গলের জন্যই সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন। হিন্দু মহিলাগণও তাঁহাকে পিতা অথবা ভ্রাতার ন্যায় দেখিতেন, এবং অসঙ্কুচিত চিত্তে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। এই সাধু পুরুষের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহারা কখনও কোন সন্দেহ করিতেন না। তাঁহাদের সন্তানগণের কল্যানবিধানই যে ইঁহার একমাত্র ব্রত, ইহা তাঁহারা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন!

"অনেকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে হেয়ার যদিও উচ্চ শিক্ষার একজন প্রধান বন্ধু ছিলেন, তথাপি তিনি স্বয়ং সুশিক্ষিত ছিলেন না। এই নির্দ্দেশ সর্ব্বাংশে সমীচীন নহে। হেয়ার সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক বিষয় জানিতেন; সরলভাবে, সরল ভাষায় ও সুযুক্তির সহিত নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারিতেন, এবং উৎকৃষ্টরূপে প্রশংসা-পত্র ও পত্রাদি লিখিতে সমর্থ হইতেন। অনেক ভাল ভাল গ্রন্থকারের গ্রন্থাদি তাঁহার আয়ত্ত ছিল। কিন্তু তাঁহার শিক্ষা অপেক্ষা তাঁহার সরলতা ও সাধুতা তাঁহাকে সাধারণের বরণীয় করিয়াছিল।

এতদ্দেশীয়গণ ডেবিড হেয়ারকে বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। একসময়ে ইঁহারা অশ্রু মোচনপূর্ব্বক হৃদয়গত শোক প্রকাশ করিতে করিতে সমাধি-স্থলে হেয়ারের অনুগমন করিয়াছিলেন। হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর পর হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহারা তাঁহার স্মরণার্থ অনেক বিষয়ে আপনাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছেন। প্রতি বৎসর তাঁহার মৃত্যুর তারিখে ইঁহারা এই উদ্দেশ্যে একটি প্রকাশ্য সভায়

সমবেত হন। এই চিরাগত পদ্ধতি ডেবিড হেয়ারের অল্প গৌরবকর স্মরণ-চিহ্ন নহে।

আমাদের দেশীয়গণ ডেবিড হেয়ারকে কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। কালের কঠোর আক্রমণে হেয়ারের প্রতিমূর্ত্তি ধ্বংস হইতে পারে, হেয়ারের সমাধি-স্তম্ভ মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার পবিত্র নাম এবং তাঁহার পবিত্র চরিত্র কখনও আমাদের দেশীয়দিগের স্মৃতি-পট হইতে স্খলিত হইবে না।

পরোপকারিণী অবলা

সারা মার্টিন।

যে গুণ অবলা-কুলের মনোহর ভূষণ, যে গুণে অবলাকুল মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা হইয়া, রোগ-শোকময় সংসারে সুখ ও শান্তির রাজ্য বিস্তার করেন, সারা মার্টিন সে গুণে চিরকাল অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি দয়া ও পরের উপকারে পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। নারী-সমাজে প্রায় কেহই তাঁহার ন্যায় অটল বিশ্বাসের সহিত কার্য্য করিয়া দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে পারেন নাই, শোকসন্তপ্তকে সান্ত্বনা দিতে পারেন নাই এবং দুরাচার ও উচ্ছৃঙ্খলদিগকে সৎপথ দেখাইতে সমর্থ হন নাই। সারা মার্টিন দুঃখীর স্নেহময়ী মাতা ও দুর্ব্বৃত্তদিগের হিতকারী উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহার কার্য্যে পবিত্র দেবভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পরের উপকারের জন্য জন্মিয়াছিলেন, এবং পরের উপকার করিয়াই আপনার জন্ম সার্থক করিয়াছিলেন।

বিলাতে ইয়ারমাউথ নামে একটি নগর আছে। এই নগরের

তিন মাইল দূরে কেইষ্টার নামে একখানি পল্লীগ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামের প্রাকৃতিক শোভা সাতিশয় মনোহর। চারিদিকে হরিদ্বর্ণ তরুসকল শ্রেণীবদ্ধ রহিয়াছে। উহার পার্শ্বে পল্লবিত লতা-সমূহ অবনত থাকিয়া বৃক্ষশ্রেণীকে অধিকতর রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। বিহঙ্গকুল ঐ সকল তরুবরের শাখায় শাখায় বসিয়া মধুরস্বরে গান করে। সময়ে সময়ে বৃক্ষ ও লতানিকুঞ্জের প্রস্ফুটিত কুসুম-রাজি গ্রামের অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিয়া থাকে। গ্রামখানি যেন প্রকৃতির ক্রীড়াকানন; দূর হইতে দেখিলে উহা শান্ত-রসাস্পদ তপোবন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

প্রকৃতির ঐ ক্রীড়া-ভূমিতে খ্রীঃ ১৭৯১ অব্দে সারা মার্টিনের জন্ম হয়। সারা মার্টিনের পিতা সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না, সামান্য ব্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। সারা জনক-জননীর একমাত্র সন্তান। কিন্তু তাঁহারা দীর্ঘকাল এই কন্যা-রত্নকে লইয়া সংসারের সুখভোগ করিতে পারেন নাই। দুরন্ত কাল আসিয়া এই সুখ অপহরণ করে। সারার বাল্যদশাতেই তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হয়। তদীয় বৃদ্ধা পিতামহী তাঁহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন। এই বৃদ্ধা সারাকে বড় ভাল বাসিতেন। পিতৃ-মাতৃ-হীন দুঃখী সন্তান কেবল এই দুঃখিনী নারীর অনুপম যত্নে ও স্নেহে রক্ষিত হইতে থাকে।

বাল্যাবস্থায় সারা মার্টিন সাতিশয় কোমল-প্রকৃতি ছিলেন। বিনয়, সারল্য ও পবিত্রতার চিহ্ন তাঁহার প্রসন্ন মুখমণ্ডলে নিয়ত বিরাজ করিত। তিনি প্রকৃতির মনোরম শোভা দেখিতে বড় ভাল বাসিতেন, বাল-গ্রামের বৃক্ষ-বাটিকায় বসিয়া বন-বিহঙ্গের সুললিত গান শুনিতে তাঁহার বড় আমোদ জন্মিত। কোমল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয় কোমল করিয়াছিল, পবিত্র কুসুম-স্তবক তাঁহাকে পবিত্রভাবে থাকিতে

শিক্ষা দিয়াছিল এবং সরল গ্রাম্যভাব তাঁহাকে সরলতা দেখাইতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। তাঁহার আবাসকুটীরের নিকটে কোনরূপ বিলাসের তরঙ্গ বা অপবিত্র ভাবের আবিলতা ছিল না। স্নিগ্ধ ও মধুর প্রকৃতির সহিত সকলই স্নিগ্ধতা ও মধুরতায় পূর্ণ ছিল। সারা ঐ রমণীয় ও পবিত্র স্থানে লালিত হইয়াছিলেন, এই রমণীয় ও পবিত্র ভাব জীবনের প্রথম অবস্থায় তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়ে সচরাচর যেরূপ শিক্ষা হইয়া থাকে, সারা মার্টিনের শিক্ষা তাহা অপেক্ষা অধিক হয় নাই। তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহের কোন সংস্থান ছিল না; সুতরাং অল্প বয়সেই তাঁহাকে বিদ্যালয় ছাড়িয়া কোনরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। চৌদ্দ বৎসর বয়সে সারা পরিচ্ছদ-নির্ম্মাণ-প্রণালী শিখিতে আরম্ভ করেন। এক বৎসর ঐ কার্য্য শিখিয়া তিনি অনেকের বাটীতে যাইয়া পরিচ্ছদ যোগাইতে প্রবৃত্ত হন। ঐ কার্য্যে যে লাভ হইত তাহাতেই কোনরূপে তাঁহার ও তদীয় দুঃখিনী বৃদ্ধা পিতামহীর ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইতে থাকে। কিন্তু সারা কেবল কাপড় যোগাইয়াই জীবিতকাল নিঃশেষিত করেন নাই। যে পবিত্র ও মহৎ কার্য্যের জন্য তিনি সাধারণের বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, এক্ষণে সেই কার্য্য করিতে তাঁহার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তের বৎসর কাল কাপড়ের ব্যবসায় করিয়া তিনি এই কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহার উদ্যম ও তাঁহার অধ্যবসায় কিছুতেই অন্তর্হিত হইল না। সুসময় সম্মুখবর্ত্তী হইল, সারা অটল বিশ্বাসের সহিত জীবনের মহৎ ব্রতসাধনে উদ্যত হইলেন।

ইয়ারমাউথ নগরে একটি কারাগার ছিল। কারাগারে দুষ্টস্বভাব কয়েদিগণ অবরুদ্ধ থাকিত। এই সময়ে তাহাদের অবস্থা যারপরনাই শোচনীয় হইয়া উঠে। তাহারা কেবল মারামারি করিয়া, জুয়া

খেলিয়া বা পরের কুৎসা করিয়া সময়ক্ষেপ করিত। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে কতকগুলি গৃহ ছিল। ঐ সকল গৃহে পর্য্যাপ্তপরিমাণে সূর্য্যের আলোক বা বায়ু প্রবেশ করিতে পারিত না; হতভাগ্য অপরাধিগণ ঐ আলোকশূন্য ও বায়ু-শূন্য গৃহে নিরুদ্ধ থাকিত। শীত-কালে ঐ সকল স্থানে তাহারা কিয়দংশে উত্তাপ পাইত বটে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাহাদের যাতনার অবধি থাকিত না। উত্তাপের সময়ে গবাক্ষ-রহিত স্বল্প-পরিসর স্থানে থাকিয়া তাহারা নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিত। ঐ শোচনীয় স্থানে তাহাদের কেহ শিক্ষাদাতা ছিল না, পবিত্র দিনে সংযত-চিত্ত হইয়া কেহ তাহাদের মঙ্গলের জন্য করুণাময় ঈশ্বরের উপাসনা করিত না। তাহারা ঘোর অন্ধকারময় স্থানে অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত। তাহারা যে গুরুতর পাপ করিয়া এই দুঃসহ যাতনা পাইতেছে, যে পাপ তাহাদের জীবন অপবিত্র ও ভবিষ্য সুখের পথ কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার জন্য কাতরভাবে অনুতাপ করিতে তাহাদের কখনও প্রবৃত্তি হইত না। পরের অনিষ্ট করিলে কি ক্ষতি হয়, ঈশ্বরের মঙ্গলময় নিয়মের বিরোধী হইলে কতদূর প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়, পবিত্র মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নষ্ট করিলে কি পরিমাণে যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা তাহারা বুঝিত না। মঙ্গল-বিধাতা ঈশ্বর তাহাদিগকে যে উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, সে উদ্দেশ্যের মহান্ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে তাহাদের কোনও ক্ষমতা ছিল না। অপবিত্রভাবে কারাগারে প্রবেশ করিত, এবং দীর্ঘকাল অপবিত্র ভাবে থাকিয়া অপবিত্র জীবনের অংশ নষ্ট করিয়া ফেলিত।

ইয়ারমাউথের কেহই এই শোচনীয় দশা-গ্রস্ত জীবদিগের মঙ্গল চিন্তা করিত না, কেহই ইহাদের কোনও উপকার করিতে যত্নবান্ হইত না। সকলেই নীরবে ও ধীরভাবে ইহাদের দুরবস্থার বিষয় শুনিত।

ইহাদের অবস্থা ভাল করিবার কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে সকলেই একান্ত অসাধ্য বলিয়া তাহাতে উপেক্ষা দেখাইত; সুতরাং ইহারা নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় ছিল। কোনও কর্ণ ইহাদের যন্ত্রণা শুনিয়া অধীর হইত না, কোনও নেত্র ইহাদের শোচনীয় দশা দেখিয়া অশ্রুপাত করিত না, এবং কোনও রসনা ইহাদের উপকারের জন্য সাধারণকে উত্তেজিত করিতে সমুত্থিত হইত না। এইরূপে হিতৈষী-বন্ধু-জন-শূন্য হইয়া হতভাগ্য কয়েদিগণ ইয়ারমাউথের অন্ধকারময় গৃহে পড়িয়া থাকিত।

১৮১৯ অব্দের ভাদ্র মাসে একটি নারী কোন গুরুতর অপরাধে এই কারা-গৃহে প্রেরিত হয়। এই হতভাগিনীর একটী সন্তান জন্মিয়াছিল; কিন্তু মাতার কোমলতা বা নির্ম্মল অপত্য-স্নেহ অভাগিনীর কঠোর হৃদয়ে স্থান পায় নাই। সে আপনার সন্তানের প্রতি কোনরূপ যত্ন বা স্নেহ দেখাইত না, এবং স্তন্য দিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিত না। প্রত্যুত নির্দ্দয়ভাবে তাহাকে নিরন্তর প্রহার করিত। রাক্ষসীর এই অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যবহারে স্নেহময়ী মহিলাদিগের কোমল হৃদয়ে সহজেই দুঃখ, বিস্ময় ও ঘৃণার আবির্ভাব হইতে পারে। ইয়ারমাউথের অনেক মহিলাই বিস্ময়ের সহিত মর্ম্মান্তিক দুঃখ ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ ঘটনায় একটি দুঃখিনী অবলার কোমল হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। অবলা কেবল দুঃখ বা ঘৃণা প্রকাশ করিয়াই নিরস্ত হইলেন না। যাহাতে অপরাধিনীর অন্তঃকরণে অনুতাপের উদয় হয়, স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের পর যাহাতে অপরাধিনী সৎপথ অবলম্বন করে, প্রীতিময়ী কামিনীর কমনীয় ভাব যাহাতে তাহার হৃদয়ে বিকশিত হয়, ইহাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইল। তাঁহার এই লক্ষ্য যেমন উচ্চতর ছিল, সাহস, যত্ন ও অধ্যবসায়ও তেমনই উচ্চতর হইয়া উঠিল।

ইয়ারমাউথের সকলে যখন ঐ মহৎ কার্য্যে উদাসীন ছিলেন, তখন এই চিরদুঃখিনী নারী কেবল ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করিয়া অটল সাহসের সহিত কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

সারা মার্টিন আপনার কার্য্যানুরোধে প্রতি দিন আবাসগ্রাম হইতে পদব্রজে ইয়ারমাউথে আসিতেন, এবং নগরের স্থানে স্থানে বস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া পুনর্ব্বার বাসগ্রামে ফিরিয়া যাইতেন। আপনার ও বৃদ্ধ পিতামহীর অন্নসংস্থান জন্য এই দুঃখিনী অবলাকে প্রত্যহ এইরূপ পরিশ্রম করিতে হইত। সারা ইহাতে একদিনের জন্যও ক্ষুব্ধ হন নাই, কিন্তু অন্য একটি বিষয়ের জন্য তাঁহার যারপরনাই ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। তিনি প্রতিদিন বাসগ্রাম হইতে ইয়ারমাউথে আসিতেন এবং প্রতিদিন অপরাধীদিগের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া যারপরনাই ক্লেশ পাইতেন। অবলা চিরদিনই প্রীতির পুত্তলী এবং অবলা চিরদিনই স্নেহ ও দয়ার প্রতিমা। অবলা যখন কোন দুঃখ-সন্তপ্তকে সুখ ও শান্তির নিকেতনে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কোমল হস্ত প্রসারণ করে তখন তাঁহার হৃদয় স্বর্গীয়ভাবে সহজেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সারার হৃদয় এক্ষণে ঐরূপ স্বর্গীয় সৌরভে আমোদিত হইয়াছিল। নিরুপায় ও নিঃসহায় জীবদিগের কষ্টের একশেষ দেখিয়া সারা তাহাদের দুরবস্থামোচনের উপায় দেখিতে লাগিলেন। কারাগারে যাইয়া ঐ হতভাগ্যদিগের সমক্ষে উপনীত হইতে এক্ষণে তাঁহার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তিনি খ্রীঃ ১৮১০ অব্দে লিখিয়াছিলেন, "আমি প্রতিদিন জেলের নিকট দিয়া যাইতাম, প্রতিদিনই আমার ইচ্ছা হইত যে, জেলে যাইয়া কয়েদীদিগকে ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়া শুনাই। আমি ইহাদের অবস্থা এবং ঈশ্বরের সন্নিধানে ইহাদের পাপের বিষয় বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছিলাম; ইহারা যেরূপে সামাজিক অধিকার নষ্ট করিয়া সমাজের সহিত সংস্রব-শূন্য

হইয়াছে, এবং শাস্ত্রীয় উপদেশে যেরূপে অনভিজ্ঞ রহিয়াছে, তাহা আমার অবিদিত ছিল না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ধর্ম্মোপদেশই ইহাদিগকে সৎপথে আনিবার একমাত্র উপায়।" দীর্ঘ কাল হইতে সারা এইরূপ আত্ম-প্রত্যয়ের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল হইতে সারার হৃদয়ে এইরূপ সহজজ্ঞানের ভাব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। ইহার পর সারা পূর্ব্বোক্ত কঠোরহৃদয়া কামিনীর ঘোরতর অপরাধের বিষয় শুনিলেন। ঐ ঘটনা তাঁহাকে পূর্ব্বসঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য করিতে অধিকতর উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তিনি আট বৎসর কাল যে ধারণা পোষণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই ধারণা অনুসারে কার্য্য করিতে বিলম্ব করিলেন না। সারা এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যাবৎ সমুদয় বিষয়ে সুবন্দোবস্ত না হইয়াছে, তাবৎ আমি এ বিষয় কাহারও নিকটে প্রকাশ করি নাই। পাছে সঙ্কল্প-সিদ্ধির কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কা আমার হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক থাকিত। ঈশ্বর আমাকে এই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, সুতরাং আমি ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ করি নাই।"

সারা মার্টিন এইরূপে সিদ্ধিদাতা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত অপরাধিনীর নাম জানিয়া লইলেন। কিন্তু প্রথমেই কারাগারে প্রবেশ করা দুর্ঘট হইয়া উঠিল। সারা বিনীতভাবে ঐ স্থানে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রথমে তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। ইহাতে পর-হিতৈষিণী অবলার উদ্যম বা অধ্যবসায় ভঙ্গ হইল না। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তার সহিত দ্বিতীয়বার প্রার্থনা করিলেন। এবার তাঁহার আশা ফলবতী হইল। সারা কারাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

কারাগারে প্রবেশ করিয়া সারা মার্টিন কি ভাবে সেই কঠোর-

হৃদয়া রমণীর সমক্ষে উপনীত হইয়াছিলেন, কি ভাবে তাঁহার অনুপম সদয় ব্যবহার, প্রীতি-পূর্ণ স্বর ও কমনীয় মুখমণ্ডলের প্রশান্ত ভাব অপরাধিনীর কঠোর অন্তঃকরণে নিদারুণ অনুতাপের সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা ইয়ারমাউথের ইতিহাসে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। সারা কারাগারে কয়েকটি অন্ধকারময় গৃহ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বোক্ত অপরাধিনী যে প্রকোষ্ঠে থাকিত, তথায় উপস্থিত হইলেন। কারাবন্দিনী তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইল। অপরিচিতকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার বিস্ময় জন্মিয়াছিল; সে কোনও কথা না কহিয়া স্থির ভাবে রহিল। পরে সারা যখন তাঁহার আসিবার উদ্দেশ্য তাহাকে জানাইলেন, সে কিরূপ গুরুতর পাপ করিয়াছে, ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা তাহার কতদুর উচিত, তাহা যখন বুঝাইয়া কহিলেন, তখন অভাগিনী স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার কঠোর হৃদয় দ্রবীভূত হইল, অন্তঃকরণে ঘোরতর অনুতাপ জন্মিল; পাপীয়সী এতক্ষণে আপনার পাপের গুরুত্ব বুঝিতে পারিল। সে আর নীরবে থাকিতে পারিল না। অবিরলধারায় অশ্রুপাত করিতে করিতে হিতৈষিণী অবলাকে ধন্যবাদ দিল।

এই সময় হইতে সারা মার্টিন একটি গুরুতর ব্রতে দীক্ষিত হইলেন, এই সময় হইতে তাঁহার কার্য্য অধিকতর বিস্তৃত ও অধিকতর উচ্চভাবে পরিপূর্ণ হইল। যে নির্ম্মল সরিৎ এতকাল সঙ্কীর্ণ কন্দরে আবদ্ধ ছিল, এই সময় হইতে তাহা চারিদিকে প্রসারিত হইয়া অনুর্ব্বর ভূ-খণ্ডকে ফলপুষ্পে শোভিত করিতে লাগিল। সারা কারাগারে প্রথমে প্রবেশ করিয়াই কয়েদীদিগের নিকটে যেমন সদয়ভাবে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল, তিনি আপনার সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিবেন। সারা প্রতিদিন পোষাক বিক্রয়ের পর যে সময় পাইতেন, সেই সময়ে কারাগারে যাইয়া

বন্দীদের নিকটে প্রথমে ধর্ম্ম-গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে অনেক বিষয়ে সাতিশয় অনভিজ্ঞ দেখিয়া যথানিয়মে শিক্ষা দিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি প্রতিদিন যে সময় ব্যয় করিতেন, এই কার্য্যে তাহা অপেক্ষা অনেক সময় আবশ্যক হইয়া উঠিল, কিন্তু সারা অধিক সময় ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। সপ্তাহের মধ্যে ছয়দিন পোষাকের কাজ করিয়া একদিন কয়েদী-দিগকে লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার ব্যবসায়ের অনেক ক্ষতি হইল, কিন্তু পরের উপকারের জন্য ঐ ক্ষতি তিনি গণনার মধ্যে আনিলেন না। এই হিতৈষিণী নারী কিরূপ উৎসাহের সহিত আপনার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিরূপ একাগ্রতা তাঁহাকে কর্ত্তব্য-পথে স্থির রাখিয়াছিল, তাহা তিনি সরলভাবে ও সরলভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ঐ প্রাঞ্জল লিপিতে অনেক উপদেশ পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার কার্য্যের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "সপ্তাহের মধ্যে একদিন পোষাক প্রস্তুত করিবার কাজ হইতে বিরত হইয়া, ঐ সকল কয়েদীদিগের শুশ্রূষা করা আমি উচিত বোধ করিয়াছিলাম। ঐ একদিন নিয়মিতরূপে ব্যয় করা হইত। উহার অতিরিক্ত অনেক দিনও ঐ কার্য্যে অতিবাহিত হইয়াছে। এইরূপে অনেক সময় ব্যয় করাতে অর্থাদির সম্বন্ধে আমি কোন ক্ষতি বিবেচনা করি নাই। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমি যে কার্য্য করিতে ছিলাম, তাহাতে আমার প্রগাঢ় সন্তোষ জন্মিয়াছিল।"

খ্রীঃ ১৮২৬ অব্দে সারা মার্টিনের বৃদ্ধা পিতামহীর মৃত্যু হয়। বৃদ্ধার যৎকিঞ্চিৎ সম্পত্তি ছিল, তাহাতে বৎসরে একশত টাকা আয় হইত। সারা মার্টিন এক্ষণে ঐ সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। তিনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আপনার বাসগ্রামে থাকিয়া সেই কার্য্য করিবার নানারূপ অসুবিধা দেখিয়া সারা এখন ইয়ারমাউথে থাকিতে

ইচ্ছা করিলেন। নগরের নির্জ্জন অংশে একটি ক্ষুদ্র বাটী ভাড়া করা হইল। সারা পরের উপকার উদ্দেশে জন্মভূমি কেইষ্টারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ঐ স্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি যে ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, ইয়ারমাউথে অবস্থান কালে অধিকতর মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের সহিত সেই ব্রত রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইখানে একটি হিতৈষিণী নারীর সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। পরোপকার-ব্রতে সারার অসাধারণ অধ্যবসায় ও উৎসাহ দেখিয়া এই নারী প্রীত হইলেন। সারার কোনরূপ সাহায্য করিতে তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা হইল। তিনি সপ্তাহের মধ্যে একদিন সারার উপজীবিকার জন্য পোষাক প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এদিকে কতিপয় সদাশয় ব্যক্তি কয়েদীদিগের উপকারার্থে সারাকে তিনমাস অন্তর এক টাকা চারি আনা করিয়া চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সারা এই সামান্য সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে কার্য্য করিতে লাগিলেন। চাঁদায় যে টাকা পাওয়া যাইত, তদ্দ্বারা তিনি ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি ক্রয় করিয়া কয়েদীদিগকে দিতেন। কারাবন্দিগণ সারার যত্নে লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিল; তাহারা নির্বিষ্টচিত্তে ঐ সকল ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ করিত। এই নিরুপায় জীবদিগের উপকারের জন্য সারা প্রতিদিন কারাগারে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার ব্যবসায়ের বড় ক্ষতি হইল; নিরূপিত সময়ে কাপড় না পাওয়াতে পূর্ব্বতন খরিদার সকল অন্য লোকের সহিত বন্দোবস্ত করিল। সারা নিদারুণ দৈন্য-গ্রস্ত হইলেন। তাঁহার যে আয় ছিল, বাটী ভাড়া দিয়া তাহার কিছুই অবশিষ্ট থাকিত না। সুতরাং গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সারা সাতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এই সময় তাঁহার নিকট বিষম সঙ্কটময় হইয়া দাঁড়াইল। আপনার অবলম্বিত ব্রত পরিত্যাগ করিবেন, না অন্ন-লালায়িত হইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া

বেড়াইবেন, তিনি এক্ষণে ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে সাধনা তাঁহার হৃদয় দেব-ভাবে পরিপূর্ণ করিয়াছিল, যাহার জন্য তিনি বাল্যের লীলা-ভূমি প্রিয়তম জন্মস্থানের মমতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সারা এক্ষণে অন্নকাতর হইয়া জীবনের সেই মহৎ সাধনা হইতে বিচ্যুত হইবেন কি না, ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু পরহিতৈষিণী অবলার হৃদয় বহুক্ষণ দোলায়মান হইল না; উহা পূর্ব্ববৎ অটল ও সুব্যবস্থিত রহিল। সারা সাতিশয় দুরবস্থায় পড়িয়াও আপনার ব্রত পরিত্যাগ করিলেন না। এই সময়ে তিনি লিখিয়াছিলেন, "যখন আমি কেবল পোষাক প্রস্তুত করিতাম, তখন এই ব্যবসায়ের জন্য আমাকে অনেক ভাবিতে হইত, ভবিষ্যতের জন্যও আমার অনেক ব্যাকুলতা ছিল; কিন্তু যখন এই ব্যবসায় বন্ধ হইল, তখন তাহার সঙ্গে ভাবনা ও ব্যাকুলতা অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমি ধর্ম্ম-গ্রন্থে পড়িয়াছি ঈশ্বর নিরুপায়কে রক্ষা করিয়া থাকেন। ঈশ্বর আমার প্রভু; তিনি কখনও তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্যকে পরিত্যাগ করিবেন না। ঈশ্বর আমার পিতা; তিনি কখনও তাঁহার অধম সন্তানকে বিস্মৃত হইবেন না। ঈশ্বর তাঁহার ভৃত্যের বিশ্বস্ততা ও সহিষ্ণুতা দেখিতে ভাল বাসেন।" সারা মার্টিনের হৃদয় কিরূপ মহানুভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, নিঃস্বার্থ হিতৈষিতা তাঁহাকে কিরূপ পবিত্রতর কার্য্যে নিয়োজিত রাখিয়া পবিত্রতর আমোদের অধিকারিণী করিয়াছিল তাহা ঐ সরল লিপির প্রতি অক্ষরে প্রকাশ পাইতেছে।

তিন বৎসর কাল এইরূপ নিঃস্বার্থভাবে ও অকাতরে পরিশ্রম করিয়া সারা মার্টিন আপনার কর্ত্তব্য-পথের এক অংশ অতিক্রম করিলেন। যাহারা এতকাল কেবল নিকৃষ্টতর কার্য্যে ও নিকৃষ্টতর আমোদে লিপ্ত ছিল, তাহারা এক্ষণে শান্ত ও সংযতচিত্ত হইয়া লেখা পড়া করিত; তাহাদের কঠোর হৃদয় কোমল হইয়াছিল; তাহারা

আপনাদের পাপের গুরুতা বুঝিয়া অনুতাপ করিত এবং ভবিষ্যতের জন্য সর্ব্বদা সাবধান থাকিত। গ্রন্থ অধ্যয়নে, সদালাপে ও উপদেশ শ্রবণে তাহাদের সময় অতিবাহিত হইত। তাহারা সরল হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ঈশ্বরের নিকটে স্বকৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিত, এবং প্রতি রবিবারে সকলে সমবেত হইয়া শান্তভাবে সেই পরমারাধ্য দেবতার আরাধনায় নিবিষ্ট হইত। কিন্তু তাহারা এ পর্য্যন্ত কোনরূপ শিল্পকার্য্যে মনোযোগ দেয় নাই; জ্ঞান ও ধর্ম্মের মহিমায় তাহারা সুশীল, বিনয়ী ও কোমল-প্রকৃতি হইয়াছিল, কিন্তু জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযোগী কোন কার্য্যে তাহাদের পারদর্শিতা জন্মে নাই। সারা মার্টিন এখন এই বিষয়ের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। প্রথমে তিনি কারাগারে নারীদিগকে সীবন-কার্য্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন; ইহার পর তাহারা পিরাণ, কোট প্রভৃতি বিবিধ গাত্রচ্ছদের নির্ম্মাণ-প্রণালী শিখিতে লাগিল। সারা কারাগারের পুরুষগণের সম্বন্ধেও নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। মহিলাদিগকে শিক্ষা দিয়া তিনি পুরুষদিগের নানাপ্রকার দ্রব্যাদির নির্ম্মাণ-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। সারা আপনার এই শেষোক্ত কার্য্যের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "১৮২৩ অব্দে এক হিতৈষী ব্যক্তি আমাকে কারাগারের দাতব্য কার্য্যের জন্য পাঁচটাকা দান করেন, সেই সপ্তাহে আমি আর একজনের নিকট হইতে এই উদ্দেশ্যে দশ টাকা প্রাপ্ত হই। আমি ভাবিলাম, এই টাকা শিশুদিগের কাপড় প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যয় করিলে ভাল হয়। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি আদর্শ ধার করিয়া আনিলাম। কাপড় কিনিয়া কয়েদীদিগকে পোষাক প্রস্তুত করিতে দেওয়া গেল। ইহাতে আমি অনেক ফল দেখিতে পাইলাম। কয়েদীরা শিশুদিগের কাপড় ব্যতীত কোট, পিরাণ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে লাগিল। যে সকল যুবতী কামিনী সেলাই করিতে জানিত না, তাহারা এই সূত্রে উহা শিখিতে লাগিল।

পূর্ব্বোক্ত ১৫টা টাকা একটি স্থায়ী মূলধন-স্বরূপ হইল; ক্রমে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭৭ টাকা হইল, এবং পরে ঐ ৭৭ টাকা চারি হাজার আটের অঙ্কে স্থান পাইল। কেবল নানাবিধ পোষাকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারাই মূলধনের এইরূপ পরিপুষ্টি হইয়াছিল।

"কয়েদীরা টুপী, চামচে ও সীল প্রস্তুত করিত। অনেক যুবক পিরাণ সেলাই করিতে শিখিয়াছিল। আমি আবশ্যক দ্রব্যের এক একটি আদর্শ তাহাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতাম; তাহারা সেই আদর্শের অনুকরণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিত, এবং অনেক সময়ে কৃতকার্য্য হইত। এক কি দুই বৎসর পরে সকলেই এইরূপে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অনুকরণ করিত। এই অনুকরণে বিশিষ্ট চিন্তা ও মনোযোগ আবশ্যক হইয়া উঠে। কিন্তু কয়েদীরা আপনাদের চিন্তা-শক্তি ও মনোযোগ দেখাইতে কাতর হইত না; সুতরাং তাহাদের সময় নির্ব্বিবাদে ও শান্তভাবে অতিবাহিত হইত।"

কারাগারে প্রতি রবিবারে উপাসনার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সারা মার্টিন প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে কয়েদীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া একান্তমনে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। সন্ধ্যাকালীন উপাসনায় সারা উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না; ইহাতে কয়েকদিন ঐ উপাসনার কার্য্য স্থগিত ছিল। ইহার পর ধর্ম্ম-গ্রন্থ পড়িবার ভার সারার হস্তে সমর্পিত হয়। সারা পবিত্র দিনে, শান্তভাবে ও সন্তুষ্ট চিত্তে কয়েদীদিগের সমক্ষে ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়া মঙ্গল-বিধাতা ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। তাঁহার স্বর কোমল, স্পষ্ট ও শ্রুতি-মধুর ছিল; কয়েদীরা এই মধুর স্বরে ঈশ্বরের স্তুতি-গান শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইত। কারাগারের একজন পরিদর্শক প্রস্তাবিত উপাসনার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—

"রবিবার, ২৯এ নবেম্বর, ১৮৩৫—অদ্য প্রাতঃকালে আমি

কারাগারের উপাসনা স্থলে উপস্থিত ছিলাম। কেবল পুরুষ কয়েদীরা এই উপাসনায় যোগ দিয়াছিল। নগরের একটি মহিলা উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহার কণ্ঠধ্বনি সাতিশয় মধুর, তাঁহার বচন-বিন্যাস-প্রণালী তেজস্বিনী, এবং তাঁহার ব্যাখ্যা নিরতিশয় সরল ও স্পষ্ট। * * * কয়েদীরা সকলে সমস্বরে দুইটী সঙ্গীত গান করিল। আমি আমাদের প্রধান প্রধান উপাসনালয়ে যে সকল গান শুনিয়াছি, ঐ সঙ্গীতদ্বয় তৎসমুদয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বোধ হইল। মহিলা নিজের লিখিত একটি বক্তৃতা পাঠ করিলেন। উহা পবিত্র নীতিতে ও প্রগাঢ় ঐশ্বরিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ। ঐ বক্তৃতা শ্রোতাদের বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল। উপাসনার সময়ে কয়েদীরা গাঢ়তর মনঃসংযম ও শ্রদ্ধা দেখাইয়াছিল, এবং যতদূর বিচার করা যায়, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল যে, তাহারা উহা আপনাদের সাতিশয় মঙ্গলকর বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। সন্ধ্যাকালে এই মহিলা স্ত্রীকয়েদীদিগের সম্মুখে ধর্ম্ম গ্রন্থ পড়িয়া উপাসনা করেন।”

এইরূপে কয়েক বৎসরের পরিশ্রমে সারা মার্টিন আপনার সাধনায় অনেকাংশে সিদ্ধ হইলেন। তিনি যে উদ্দেশ্যে কারাগারে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন, যে উদ্দেশ্যে আপনি নানারূপ কষ্ট সহিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য এক্ষণে সফল হইল। বৎসরের পর বৎসর পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল; প্রতিবৎসর অভীষ্ট বিষয়ের নূতন নূতন ফল দেখিয়া সারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তাঁহার যত্নে কয়েদীরা নীতিজ্ঞান লাভ করিল, করুণাময় ঈশ্বরের উপাসনা করিতে শিখিল, এবং নানা প্রকার শিল্পকার্য্যে নিপুণ হইয়া জীবিকা-নির্ব্বাহের পথ পরিষ্কৃত করিয়া তুলিল। পৃথিবীর মনস্বী ও মহৎ ব্যক্তিগণ যে কার্য্য দুঃসাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছিলেন, যে কার্য্য সম্পাদনের উপায় উদ্ভাবনে তাঁহাদের চিন্তাশক্তি অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, একটি দরিদ্র মহিলা কেবল

ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া অটল সাহসের সহিত সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। সমস্ত জগৎ বিস্মিত হইয়া এই মহিলার লোকাতীত উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের নিকট মস্তক অবনত করিল। বর্ণনীয় সময়ে কারাগারের সংস্করণ-প্রণালী সুব্যবস্থিত ছিল না, কি উপায়ে হতভাগ্য অপরাধিগণের চরিত্র সংশোধিত ও অবস্থা উন্নত হইতে পারে, তাহা কেহই নির্দ্ধারণ করেন নাই; এই সময়ে সারা অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে কার্য্য করিয়া যেমন ফল পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিচক্ষণতা ও অধ্যবসায়ের বিস্তর প্রশংসা করিতে হয়। তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা নিঃস্বার্থভাবে ও বিশিষ্ট মনোযোগের সহিত সম্পন্ন করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর সকল স্থলেই ন্যায়পরতা ও সাধুতার সম্মান রক্ষিত হইয়াছিল। তিনি অপরের নিকট গৌরব বা প্রশংসালাভের প্রত্যাশায় এই ব্রতে দীক্ষিত হন নাই, জগতে খ্যাতিলাভের বাসনা এক দিনের জন্যও তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তিনি নির্জ্জন স্থানে নীরবে ও দরিদ্রভাবে কালাতিপাত করিতেন, নীরবে আপনার কার্য্য-প্রণালী নির্দ্ধারণ করিতেন এবং নীরবে ও সাবধানে আপনার সঙ্কল্প অনুসারে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া তুলিতেন। হিতৈষিতা এইরূপে নীরবে উত্থিত হইয়া নীরবে হতভাগ্য জীবদিগকে শান্তির অমৃত-প্রবাহে অভিষিক্ত করিত। এই দরিদ্র মহিলা নীরবে কার্য্য করিয়া যে মহত্ত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকের হট্ট-কোলাহলময়ী প্রতিপত্তি ও প্রশংসাকে অধঃকৃত করিয়াছে।

যে সমস্ত কয়েদী ইয়ারমাউথের কারাগারে অবস্থান করিত, সারা মার্টিন তাহাদের একটি তালিকা রাখিতেন। ঐ তালিকায় কয়েদী-দিগের নাম ও অপরাধের বিবরণ প্রভৃতি লিখিত থাকিত। সারার ঐ তালিকায় দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা চুরি ও ডাকাইতি দ্বারা

সাধারণকে দরিদ্র করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের অন্যেকে ঐ স্থানে আবদ্ধ থাকিত। ভৃত্যেরা তাহার প্রতিপালক প্রভুর অনিষ্ট করিয়া, দুশ্চারিণী কামিনীরা আপনাদের উদ্দাম মনোবৃত্তি সংযত রাখিতে না পারিয়া, এবং বালকেরা স্বেচ্ছাচারী হইয়া, ঐ ভয়ঙ্কর অন্ধকারময় গৃহে প্রবেশ করিত। সারা ঐ সকল দুর্ব্বিনীত জীবকে স্নেহাস্পদ সন্তানের ন্যায় আপনার তত্ত্বাবধানে আনিয়া সৎপথ দেখাইতেন। এই দুর্ব্বিনীত সম্প্রদায় চারিদিকে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে নীতি কথা শুনিত। মূর্ত্তিমতী করুণার এই মহত্ত্ব কি স্বর্গীয়ভাবের পরিচায়ক! যে বিশ্বাস এইরূপ নিঃস্বার্থভাবের পরিপোষক ও দৃঢ়তার অবলম্বন, তাহা পর্ব্বতকেও বিচলিত করিতে পারে এবং যে স্বার্থত্যাগ এইরূপ উদার নীতির উপরে স্থাপিত, তাহা মানবজাতির স্বর্গীয় আভরণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

এই সময় সারা মার্টিনকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, অনেক প্রকার চিন্তার তরঙ্গে তিনি এই সময়ে নিরন্তর আহত হইয়াছিলেন। এতকাল তিনি কেবল আপনার বৃদ্ধা পিতামহীর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে অনেকগুলি নিঃসহায় জীব তাঁহার শিক্ষাধীন হওয়াতে তিনি অনেকের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিরূপে ইহাদের উন্নতি হইতে পারে, কিরূপে ইহারা পুনর্ব্বার সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব পাইতে পারে, ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইল। তিনি প্রতিদিবস কারাগারে ছয় সাত ঘণ্টা থাকিয়া ইহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। ইহারা যে যথানিয়মে শিক্ষা পাইত তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। সারা মার্টিন ইহাদের শিক্ষা-প্রণালীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যাহারা পড়িতে জানিত না, আমি তাহাদিগকে পড়িতে উৎসাহ দিতাম; আর সকলে আমার অনুপস্থিতিতে তাহাদের সহায়তা করিত। ইহারা লিখিতে শিখিয়াছিল; ইহাদিগকে

যে সকল পুস্তক দেওয়া যাইত, তৎসমুদয় হইতে ইহারা অনেক বিষয় নকল করিত। যে সকল কয়েদী পড়িতে শিখিয়াছিল, তাহারা আপনাদের ক্ষমতা ও রুচি অনুসারে পুস্তক না দেখিয়া ধর্ম্ম-গ্রন্থের অংশবিশেষ আবৃত্তি করিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমিও তাহাদের সম্মুখে ঐরূপে ধর্ম্ম-গ্রন্থের আবৃত্তি করিতাম। 'উহার ফল অতিশয় সন্তোষ-জনক হইয়াছিল। অনেকে প্রথমে কহিয়াছিল যে, ইহাতে তাহাদের কোন উপকার হইবে না। আমি উত্তর দিয়াছিলাম, 'ইহা আমার উপকারে আসিয়াছে, তোমাদের উপকারে আসিবে না কেন? তোমরা ইহার জন্য চেষ্টা করিতেছ না, কিন্তু আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি।' শিশু-পাঠ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক ও অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ সর্ব্বসমেত চারি পাঁচ খানি প্রতিদিন গৃহ হইতে গৃহান্তরে প্রেরিত হইত। যাহারা অধিক পড়িতে শিখিয়াছিল তাহাদিগকে উহা অপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থ দেওয়া যাইত।"

সারা মার্টিন এইরূপে সরলভাবে আপনার কার্য্যপ্রণালীর বর্ণনা করিয়াছেন। এই লিপিতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, কয়েদীদের কেহই লেখাপড়ায় অবহেলা করিত না। সারার যত্নে ও আগ্রহে সকলেই বিদ্যা-শিক্ষায় মনোযোগী হইত। যখন ইহারা কারাগৃহে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিল তখন ইহাদের মূর্ত্তি যেমন ভয়ঙ্কর, প্রকৃতিও তেমনি কুৎসিত ছিল। ইহাদিগকে সে সময়ে মূর্ত্তিমান পাপ বলিয়া বোধ হইত। হিতৈষিণী সারা ইহাদের কঠোর হৃদয় কোমলতায় অলঙ্কৃত করেন এবং কুৎসিত প্রকৃতি অনন্ত সৌন্দর্য্যে শোভিত করিয়া তুলেন। তিনি সকলের সহিতই সরলভাবে আলাপ করিতেন, সকলকেই সমান আদরে নীতি শিক্ষা দিতেন, নিরুপম মাতৃ স্নেহ সকলের উপরেই সমান ভাবে প্রসারিত হইত; সকলেই তাঁহাকে মাতার ন্যায় ভালবাসিত, এবং দেবীর ন্যায় সম্মান করিত। তাঁহার সমবেদনা সার্ব্বজনীন ছিল।

তিনি সকলেরই রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, সকলের জন্যই অশ্রুপাত করিতেন, এবং সকলের মঙ্গলার্থই করুণাময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার চারিদিকে কেবল দুঃখ, নীচতা, দুর্ব্বলতা ও বিশ্বাস ঘাতকতার প্রতিবিম্ব ছিল। কিন্তু ইহাতে কখনও তাঁহার কোনরূপ অসন্তোষ দেখা যায় নাই। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে দুঃখিতকে সুখের পথ দেখাইতেন, নীচকে উচ্চতর গুণগ্রামে ভূষিত করিতেন, দুর্ব্বলকে সবল হইতে সাহস দিতেন এবং বিশ্বাস-ঘাতককে সদুপদেশ দিয়া পরম বিশ্বস্ত করিয়া তুলিতেন।

প্রতিদিন জেলের কার্য্য শেষ করিয়া সারা মার্টিন শ্রমজীবিদিগের বিদ্যালয়ে যাইয়া যথারীতি শিক্ষা দিতেন। কিন্তু তাঁহাকে দীর্ঘকাল এই কার্য্য করিতে হয় নাই। সে স্থানে উপযুক্ত শিক্ষকগণ নিযুক্ত হইলে সারা বালিকা-বিদ্যালয়ে যাইয়া শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন। রাত্রি-কালে ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা হইত। সারা সপ্তাহের মধ্যে দুই রাত্রি বিদ্যালয়ের কার্য্য করিতেন। তাঁহার অধ্যাপনা-গুণে ঐ বিদ্যালয়ের বিস্তর উন্নতি হইয়াছিল। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটি বালিকা তাঁহার নিকটে শিক্ষা পাইত। তিনি সকলকে নীতি-গর্ভ কবিতা পড়াইতেন, এবং গল্পচ্ছলে অনেক উপদেশ দিতেন। ধর্ম্ম-গ্রন্থে সারার বিশিষ্ট অধিকার ছিল। তিনি বৎসরে চারিবার অভিনিবেশ সহকারে ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। পবিত্র গ্রন্থের সমুদয় উপদেশ ও সমুদয় কাহিনী তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। অধ্যাপনার সময়ে তিনি কথা-প্রসঙ্গে ঐ গ্রন্থের সদুপদেশ-গুলি ছাত্রীদিগের সমক্ষে বিবৃত করিতেন। সারার উদার উপদেশে বালিকাদের হৃদয়ে যেমন কর্ত্তব্য-বুদ্ধির আবির্ভাব হইয়াছিল, তেমন অনেক মহত্তর গুণ স্থান-পরিগ্রহ করিয়াছিল। অধ্যাপনা শেষ হইলে সারা বিশ্বস্তভাবে সকলের সহিত আলাপ করিতেন। সকলেই তাঁহার নিকটে বসিয়া মনোরম কাহিনী শুনিত। তিনি কখন গৃহ-ধর্ম্মের

উপদেশ দিতেন, কখন ছাত্রীদের অবস্থা শুনিয়া তাহাদিগকে কর্ত্তব্য-পথ দেখাইতেন, কখন বা সরল ভাষায় পবিত্র ঐশ্বরিক তত্ত্ব বুঝাইয়া সকলকে আমোদিত করিতেন। সারা কেবল বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন না, সকলের বন্ধু ও সকল সময়ে সৎপরামর্শ-দাত্রীও ছিলেন।

সারা সন্ধ্যাকালে পীড়িত ব্যক্তিদিগের শুশ্রূষায় ব্যাপৃত হইতেন। কারখানা প্রভৃতি স্থলে যে সকল রোগী থাকিত, তিনি যথানিয়মে তাহাদিগকে ঔষধ ও পথ্য দিতেন। এইরূপে দিবসে. সায়ন্তন সময়ে ও রাত্রিতে স্নেহময়ী অবলা নিঃস্বার্থভাবে কেবল পরের উপকার করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতেন। নগরের যে সকল সদাশয় ব্যক্তির সহিত সারার আত্মীয়তা ছিল, তাঁহারা সারার কার্য্যের অনুমোদন করিতেন এবং সরলহৃদয়ে তাঁহার সহিত সমবেদনা দেখাইতেন। সারা সময়ে সময়ে তাঁহাদের গৃহে যাইয়া পবিত্র আমোদ উপভোগ করিতেন। সারা সমাগত হইলে সেই গৃহে আনন্দ-প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। কর্ত্তা আহ্লাদের সহিত তাঁহার সম্মুখে আসিতেন, গৃহিণী সমুচিত আদরের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিতেন, বালকবালিকারা প্রফুল্লমুখে আসিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিত; সারা সকলের সহিতই সরলভাবে সম্ভাষণ করিতেন। তিনি কয়েদীর নির্ম্মিত দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং প্রতিগৃহে ঐ সকল দ্রব্য দেখাইয়া যুবতীদিগকে শিল্পকার্য্যে উৎসাহিত করিতেন। যে সকল পুরাতন বস্ত্রখণ্ড, কাগজ বা অন্য কোন দ্রব্য গৃহের লোকে অকর্ম্মণ্য ভাবিয়া দূরে নিক্ষেপ করিত, সারা তৎসমুদয় চাহিয়া লইতেন; যাহাতে ঐ সকল দ্রব্যের সদ্ব্যবহার হয়, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ও যত্ন ছিল। তিনি কোন বস্তু অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া ফেলিয়া দিতেন না, এবং কিছুই অপদার্থ ভাবিয়া অবজ্ঞার চক্ষে চাহিয়া দেখিতেন না। গৃহিণীরা সকল দ্রব্যের সদ্ব্যবহার

করিতে শিখেন, ইহা তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল। তিনি সকল সময়েই তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে পরামর্শদান বা অনুরোধ করিতেন। যে সময়ে গৃহে কোন আগন্তুক বা অপরিচিত ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিতেন সে সময়ে সারা বিশ্বস্তভাবে আত্মীয়দিগের সমক্ষে কারাগারের বিবরণ প্রকাশ করিতেন। যে সকল অপরাধী তাঁহার তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে তিনি তাহাদের সুব্যবস্থার সম্বন্ধে কখনও আশা প্রকাশ করিতেন, কখনও বা নিরাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেন। প্রীতি-ভাজন আত্মীয়জনের নিকটে তিনি কোন কথাই গোপন রাখিতে ইচ্ছা করিতেন না; সরলভাবে সরল ভাষায় প্রকৃত বিষয় কহিয়া সকলকেই আপনার সুখদুঃখের অংশী করিতেন। এইরূপ সরল ও পবিত্র গোষ্ঠী-কথায় সারার সায়ন্তন সময় অতিবাহিত হইত।

সারার আবাস-বাটীতে কেহই ছিল না। তিনি প্রতিদিন গৃহে চাবি দিয়া আপনার দৈনন্দিন কার্য্য করিতে বাহিরে যাইতেন। পবিত্র কর্ত্তব্য সম্পাদনের পর ফিরিয়া আসিলে কেহই তাঁহার সম্ভাষণ করিত না, কেহই গৃহ-কার্য্যে তাঁহার সাহায্য করিতে উদ্যত হইত না। সারা আপনার গৃহে একাকিনী থাকিতেন। তিনি একাকিনী গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন এবং একাকিনী গৃহে ফিরিয়া আসিয়া স্বহস্তে সমুদয় কার্য্য করিতেন। সারা এই গৃহে আপনার কার্য্যপ্রণালী ও কয়েদীদিগের সমুদয় বিবরণ এবং আয়ব্যয়ের সমস্ত হিসাব যত্নের সহিত রাখিতেন। বহুকাল এগুলি সারার গৃহে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহা ইয়ারমাউথের একটি সাধারণ পুস্তকালয়ে রহিয়াছে।

সারা মার্টিন এইরূপে প্রাত্যহিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, এইরূপে সকল সময়ে ও সকল স্থানে তাঁহার করুণার পবিত্র সৌন্দর্য্য বিরাজ করিত। তাঁহার আয় যৎসামান্য ছিল; উহাতে অতিকষ্টে তাঁহার

ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইত। ইয়ারমাউথের অন্ধকারময় কারাগারবাসী ব্যক্তিগণ অপেক্ষা তাঁহার অবস্থা বড় ভাল ছিল না। কিন্তু ইহাতে তিনি একদিনের জন্যও কাতরতা দেখান নাই। তাঁহার হৃদয় পবিত্র ঐশ্বরিক চিন্তায় নিরন্তর প্রসন্ন থাকিতে। তিনি বিপন্নের সাহায্য করিয়া সন্তোষ-সাগরে নিরন্তর নিমগ্ন থাকিতেন। নগরের কোলাহল তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইত না, কোনরূপ জনতা তাঁহার গৃহের শান্তিভঙ্গ করিত না। তাঁহার গৃহ নীরব ও নির্জ্জন ছিল। সারা এই নির্জ্জন স্থানে একমাত্র ঈশ্বরের অসীম করুণার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন। নির্জ্জন স্থানে থাকাতে তাঁহার কোনরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইত না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান পিতার নিকটে আছেন ভাবিয়া আশ্বস্ত হইতেন, এবং সর্ব্বশক্তিমান্ পিতা বিপদে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন ভাবিয়া সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিতেন। সুতরাং নির্জ্জন-বাস তাঁহার শান্তিদায়ক ছিল। তিনি কার্য্যক্ষেত্রের নানাপ্রকার বিঘ্ন-বিপত্তিকর সংগ্রামে বিজয়-শ্রী অধিকারপূর্ব্বক ঐ স্থানে আসিয়া ঈশ্বরের স্তুতিগানে শান্তি লাভ করিতেন।

ঐ নির্জ্জন স্থানে শান্তি-সুখের মধ্যে পর-হিতৈষিণী অবলার পবিত্র জীবন-স্রোত অনন্ত স্বর্গীয় প্রবাহে মিশিয়া যায়। খ্রীঃ ১৮৪৩ অব্দের ১৫ই অক্টোবর বায়াত্ত্ব বৎসর বয়সে সারা মার্টিনের মৃত্যু হয়।

সারা মার্টিন মহিলা-কুলের আদর্শ-স্থল। তাঁহার করুণা যেমন অতুল্য ছিল, সাহসও তেমন অসাধারণ ছিল। তিনি অবলা-হৃদয়ের অধিকারিণী হইয়া যে সকল মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, অনেক সাহস-সম্পন্ন পুরুষেও তাহা করিতে পারেন নাই। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরের ভাব তাঁহাকে সকল সময়েই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়-সম্পন্ন করিয়া রাখিত। আপনার অসাধারণ কৃতকার্য্যতায় তিনি কখনও গর্ব্ব প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার মুখমণ্ডল সর্ব্বদা বিনয় ও শীলতায়

শোভিত থাকিত। তিনি যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহাই অবলা-সুলভ ধীরতা ও নম্রতার সহিত সম্পন্ন করিয়া তুলিতেন। তাঁহার কোমল প্রকৃতি কখনও অকৃতজ্ঞতায় কলুষিত হইত না এবং তাঁহার অসামান্য দয়াও কখন পক্ষপাতের ছায়া স্পর্শ করিত না। তিনি সকল সময়েই নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন। সকল সময়েই পবিত্রতার কমনীয় কান্তি তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিত। তিনি ইয়ারমাউথের প্রায় সকল স্থানেই যাইতেন। নগরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, আত্মসুখের উপায় উদ্ভাবন করাও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না; দুঃখীর দুঃখমোচন করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তিনি শোক ও যাতনার পরিমাণ করিতেন, দুঃখের সীমা নির্দ্ধারণ করিতেন এবং অশান্তির কারণ নির্দ্দেশে ব্যাপৃত হইতেন। তাঁহার কল্পনা ঐ সমস্ত সন্তাপকে দূরীভূত করিবার উপায় নির্দ্ধারণে নিযুক্ত থাকিত। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সর্ব্বাংশে নূতন ছিল; উহার সকল স্থলেই প্রতিভা ও পবিত্র হিতৈষিতার চিহ্ন লক্ষিত হইত। ঐ কার্য্য-প্রণালী একটি প্রধান আবিষ্ক্রিয়া। দয়ার শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিবার উহা একটি প্রধান উপায়। সারা মার্টিনের জীবন-চরিত সকলেরই মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করা উচিত। কামিনীর কোমল হৃদয়ে এই পবিত্র জীবনের প্রতি ঘটনা দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সারা মার্টিন সমস্ত পৃথিবীর নিকটে শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাইবার যোগ্য। দয়া, ধর্ম্ম ও পরোপকারে তিনি আপনার সমকালীন সকল ব্যক্তিকেই অতিক্রম করিয়াছেন। হাউয়ার্ড * প্রভৃতি হিতৈষিগণ যে গুণে স্মরণীয় হইয়াছেন, এই চিরদুঃখিনী অবলার সে গুণের কোনও অভাব ছিল না।

* জন হাউয়ার্ড ১৭২৬ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী হাক্‌নে নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিকম্পে লিসবন নগরের কিরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল, তাহা

নিঃস্বার্থ দানবীর

হাজি মহম্মদ মহসীন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন আরব, পারস্য, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি রাজকার্য্য ও বাণিজ্য ব্যপদেশে এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন। সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ সময়ে, একদা পারস্য দেশের অন্তর্গত ইস্পাহান নগরবাসী আগামোতাহার নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সুখ-সৌভাগ্যের অন্বেষণে ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লীনগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। গুণগ্রাহি সম্রাট্ এই নবাগত ব্যক্তির গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে উপযুক্ত রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। মোতাহার স্বীয় কার্য্যদক্ষতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় ক্রমে কোষাধ্যক্ষের পদে উন্নীত হইলেন এবং প্রচুর ধনসম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া সম্রাট্-সভায় বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। কিছুকাল পরে তিনি বঙ্গের তদানীন্তন বাণিজ্য-প্রধান নগরী হুগলীতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতঃ জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিবেন স্থির করিলেন। সম্রাট তাঁহার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হহয়া তাঁহাকে যশোহর ও

দেখিবার জন্য হাউয়ার্ড ১৭৫৬ অব্দে তথায় যাইতেছিলেন, ঘটনাক্রমে তাঁহাদের জাহাজ ফ্রান্সে নীত হয়। হাউয়ার্ড ফরাসীদের কারাগারে অবরুদ্ধ হন। কারাগারের দূষিত প্রণালীপ্রযুক্ত এই সময়ে কয়েদীদিগকে যাতনার একশেষ ভুগিতে হইত। হাউয়ার্ডকেও নানা যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়। এই অবধি হাউয়ার্ড কারালয়ের দূষিত প্রণালীর সংস্কার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তিনি মুক্তিলাভ করিয়া স্বদেশে আসিয়া এ বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করেন। হাউয়ার্ড ইউরোপের প্রধান প্রধান নগরের কারাগার দেখিয়া কয়েদীদিগের অবস্থা বর্ণনা করেন। তিনি লোক-হিতৈষী ছিলেন। সংক্রামক রোগাক্রান্তদিগকেও নিজে দেখিতে ত্রুটি করিতেন না। এক সময়ে হাউয়ার্ড একটি সংক্রামক জ্বররোগীকে দেখিতে গমন করেন। ইহাতে তাঁহারও ঐ রোগ জন্মে। উহাতেই ১৭৯০ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হাজি মহম্মদ মহসীন।

নদীয়া জেলায় অনেকগুলি জায়গীর প্রদান করেন। তখন তিনি দিল্লী রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, হুগলী নগরে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং তথায় একটী বাসস্থান ও ইমামবাড়া নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ব্যবসা আরম্ভ করিলেন।

সেকালে সরস্বতী-নদীতীরবর্ত্তী সপ্তগ্রাম বঙ্গদেশের ইতিহাস-বিশ্রুত বাণিজ্য-প্রধান নগর ছিল; কিন্তু সরস্বতী নদী ক্রমশঃ জল-শূন্য হওয়ায় সপ্তগ্রামের সৌভাগ্যশ্রী বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পর্ত্তুগীজগণ ভাগীরথীর তীরে গোলিন্ নামক একটী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ কালক্রমে হুগলী নামে খ্যাত হইয়া, সপ্তগ্রামের নষ্ট সমৃদ্ধি অধিকার করিতে লাগিল। ক্রমে ইংরেজ, ফরাসী, দিনেমার প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণ তথায় বিপনি স্থাপন করিলেন। আগা-

মোতাহার যখন হুগলীতে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন, তখন সেখানে বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য মুসলমান বাস করিতেন। ধনে, জনে, সমৃদ্ধিতে হুগলী তখন বঙ্গদেশের নগর সমূহের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল।

অল্পকাল মধ্যে আগামোতাহার ব্যবসা বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতিলাভ করিলেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া হুগলী নগরে গণ্যমান্য হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিপুল অর্থ ছিল, তদ্দ্বারা তখন তিনি ভূসম্পত্তি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্পদিন মধ্যে তিনি হুগলী, নদীয়া, বৰ্দ্ধমান প্রভৃতির অন্তর্গত অনেক ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া বঙ্গের একজন বিখ্যাত ভূম্যধিকারী হইয়া উঠিলেন।

নানাবিধ অভাব অসুবিধাপূর্ণ সংসারে অভাবের দাস মানুষকে সর্ব্ববিষয়ে সুখী হইতে প্রায় দেখা যায় না। আগামোতাহার প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াও সুখী হইতে পারিলেন না। কারণ বিধাতা তাঁহাকে অপত্যধনে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা মনঃকষ্টে কালযাপন করিতেন। ইহার কিছুদিন পরে একরূপ বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার একটী কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। বৃদ্ধ মোতাহার আদর করিয়া কন্যাসন্তানের নাম রাখিলেন মন্নুজান খানম্।

শেষদশায় কন্যাসন্তানের মুখ দেখিয়া বৃদ্ধ মোতাহার অপরিসীম সন্তোষ লাভ করিলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল এই কন্যারত্নকে লইয়া সংসারের সুখভোগ করিতে পারেন নাই। দুরন্ত কাল আসিয়া এই সুখ অপহরণ করে। ৭৮ বৎসর বয়সে আগামোতাহারের হুগলী নগরে পরলোক-প্রাপ্তি হয়। মৃত্যুকালে দানপত্র দ্বারা কন্যাকে আপনার বিপুল সম্পত্তি দান করিয়া যান। মোতাহারের দানপত্র অতি কৌশলে সম্পাদিত হইয়াছিল। কথিত আছে, মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে মোতাহার কন্যাকে একটী বড় সুবর্ণ তাবিজ প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন যে,

"মা মন্নু, আমি তোমাকে যে তাবিজ প্রদান করিলাম আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে উহা কখনও ভাঙ্গিও না। আমার মৃত্যুর পর ভাঙ্গিলে বুঝিতে পারিবে যে তাবিজটি কিরূপ মূল্যবান্।" মন্নুজান পিতার মৃত্যু সময়ে দ্বাদশ বৎসরের বালিকা হইলেও পিতার আদেশ লঙ্ঘন করেন নাই। পিতার মৃত্যুর পরে ঐ তাবিজ সকলের সম্মুখে ভগ্ন করিয়া দেখিলেন যে, তাহার ভিতরে একখানি কাগজে মোতাহারের দানপত্র রহিয়াছে। সকলে বিস্মিত হইয়া পড়িয়া দেখিলেন যে, আগামোতাহার স্বকীয় তাবৎ সম্পত্তি একমাত্র কন্যা মন্নুজানকে দান করিয়া গিয়াছেন। বালিকা মন্নুজান পিতার বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হইলেন।

আগামোতাহার মৃত্যুকালে হাজি ফয়জুল্লা নামক একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। আগামোতাহারের মৃত্যুর পরে হাজি ফয়জুল্লা মন্নুজানের বিপুল সম্পত্তি যথারীতি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী মন্নুজান নাবালিকা, তাঁহার মাতা জয়নাবখানম্ মোতাহারের বৃদ্ধ বয়সের তৃতীয় পক্ষের পত্নী, স্বামী মৃত্যুকালে তাঁহাকে বিপুল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিতা করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। আগামোতাহারের বিপুল ধনরাশি লাভের আশায় অনেকেই তাঁহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হাজি ফয়জুল্লা দেখিলেন, জয়নাবখানম্‌কে বিবাহ না করিলে এই সম্পত্তি রক্ষার উপায় নাই; কারণ তাহা না করিলে হয়ত অন্য কেহ তাঁহাকে হস্তগত করিয়া বিশৃঙ্খলা ঘটাইবে। সুতরাং তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। অল্পদিন মধ্যে মন্নুজানের মাতা জয়নাবখানম্ বৈধব্যাবস্থায় মুসলমান ধর্ম্মানুমোদিত প্রচলিত রীত্যনুসারে হাজি

ফয়জুল্লাকে পতিত্বে বরণ করিলেন। এবং তাঁহারা সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন; ষড়যন্ত্রকারীদিগের সমস্ত মন্ত্রণা ব্যর্থ হইল। এই দম্পতি হইতেই প্রাতঃস্মরণীয় হাজি মহম্মদ মহসীনের জন্ম হয়।

খৃঃ ১৭৩২ অব্দে হুগলী নগরে মহম্মদ মহসীন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ আগা ফয়জুল্লা পারস্যদেশীয় একজন সম্ভ্রান্ত বণিক ছিলেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহম্মদ মহসীনের ন্যায় দানশীল, দয়াবান, বিদ্যানুরাগী ও স্বজাতিবৎসল মহাপুরুষ অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহসীন তাঁহার বৈপিত্র-ভগ্নী মন্নুজানের আট বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। আগামোতাহারের ভবনে বালক মহসীন পিতা, মাতা ও ভগ্নীর সহবাসে বাল্যজীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এক গৃহে একই স্থানে একই স্নেহময়ী জননীর অঞ্চলচ্ছায়ায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া উভয়ে উভয়ের প্রতি অতি মাত্রায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহসীনের যেমন ভগ্নী মন্নুজানের প্রতি ঐকান্তিক প্রীতি ও অনুরাগ ছিল, মন্নুজানেরও তেমনি ভ্রাতা মহসীনের প্রতি হৃদয়ের গভীর স্নেহ বিদ্যমান ছিল।

সে কালের শিক্ষা পদ্ধতির অনুরূপ ভাবে সিরাজী নামক একজন বহুদর্শী সুশিক্ষিত মুসলমান পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট মহসীন ও মন্নুজানের শিক্ষারম্ভ হয়। শিক্ষায় তাঁহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া অধ্যাপক সিরাজী সাতিশয় যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সিরাজী নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া প্রচুর জ্ঞানলাভ করতঃ হুগলীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বাগবিন্যাসের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তাঁহার কৌতূহলপূর্ণ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বালক মহ-

সীনের অন্তঃকরণে দেশ-ভ্রমণ বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। মহসীন সুযোগ পাইলেই গুরুর নিকট বিভিন্ন দেশের নরনারীর বৃত্তান্ত, আচার ব্যবহার, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রভৃতি নানা বিষয় জানিতে ব্যগ্র হইতেন।

সে কালে সঙ্গীতশিক্ষাও অত্যন্ত আদরণীয় ছিল। ভারতবর্ষের নানা স্থানে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ সঙ্গীতানুশীলন করিতেন; হুগলীতেও সে সময়ে সঙ্গীত-বিদ্যার বিশেষরূপ অনুশীলন হইত। সে সময়ে হুগলীতে যশোহর-নিবাসী ভোলানাথ সিংহ নামে একজন সুদক্ষ সঙ্গীত-বিদ্ পণ্ডিত বাস করিতেন। মহসীন ও মন্নুজান এই খ্যাত-নামা ভোলানাথ সিংহের নিকট সেতার ও সঙ্গীত শিক্ষা করিতেন। সঙ্গীতবিদ্যায় মহসীনের বিশেষ কৃতিত্ব জন্মিয়াছিল। শারীরিক উন্নতির প্রতিও মহসীনের বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। কুস্তীকরা, অস্ত্রচালনা, পদব্রজে ভ্রমণ এবং অন্যান্য বহুবিধ ব্যায়াম দ্বারা তিনি শরীরে অসাধারণ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। শারীরিক শক্তিসঞ্চয়ে, বিদ্যালাভে যেমন তাঁহার অসাধারণ মনোযোগ ছিল, তদ্রূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানেও শৈশব হইতে দৃঢ়তা দেখা যাইত। কখনও মিথ্যা কথা বলিতেন না, সাধ্যানুরূপ সেই শৈশব হইতেই দীন দরিদ্রকে সাহায্য করিতেন।

তখন মুর্শিদাবাদ বঙ্গদেশের রাজধানী ও শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। তথায় বহুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত মৌলভী এবং মুন্সী বাস করিতেন এবং নানা দেশ হইতে বিদ্বন্মণ্ডলী সমবেত হইতেন। মহসীন জ্ঞানানুশীলনোদ্দেশে মুর্শিদাবাদে গমন করিলেন এবং তত্রত্য কৃতবিদ্যগণের নিকট নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও গুণ-গরিমার কথা নবাবের কর্ণগোচর হইল। নবাব তাঁহাকে রাজসরকারের একটী সম্মানিত পদে নিযুক্ত করিলেন। মহসীন সুচারুরূপে স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে

লাগিলেন। এইরূপে কয়েক বৎসর মুর্শিদাবাদে অতিবাহিত হইল। রাজদরবারে তাঁহার সম্মান প্রতিপত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মভাব প্রবল থাকায় বৈষয়িক কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। শেষে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক হুগলীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আবার কতিপয় বৎসর পরে মন্নুজানের ও মহসীনের মিলন হইল। শৈশবের প্রীতি ও স্নেহ উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায়ই বিদ্যমান ছিল। এই সময়ের মধ্যে হাজি ফয়জুল্লা ও জয়নাবখানমের পরলোক-প্রাপ্তি হয়। এ সময়ে মহসীনের হুগলীতে ফিরিয়া আসায় মন্নুজানের পক্ষে পরম মঙ্গলের কারণ হইয়াছিল। মন্নুজান পিতৃপ্রদত্ত বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হওয়াতে, কতকগুলি হিংসা-পরায়ণ নীচাশয় ব্যক্তি তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল। এক সময়ে ঐ সকল ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া মন্নুজানের বিষয় সম্পত্তি অপহরণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে বিষ-প্রয়োগে বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। মহসীন এ সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া অতি কৌশলে প্রিয়তমা ভগ্নীর জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় তরুণ বয়সেই মহসীনের স্বভাব-কোমল হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয়। মহসীন দারপরিগ্রহ করিলেন না। সংসার-বন্ধনমুক্ত তাপস ভগবৎপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া পারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা, আত্মীয় স্বজনের ভালবাসা, প্রিয়তমা ভগ্নীর অকপট স্নেহ প্রভৃতির দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া খৃঃ ১৭৯৫ অব্দে হুগলী পরিত্যাগ করিয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। এ সময়ে তাঁহার বয়স ৩২ বৎসর মাত্র ছিল। দেশ-ভ্রমণে যেমন ধর্ম্মপিপাসু বিমল আনন্দ উপভোগ করেন, সেইরূপ জ্ঞান-পিপাসুর অন্তরেও অপূর্ব্ব সুখের উদয় হয়। এই সময়ে দেশভ্রমণের কোন সুবিধা ছিল না। নানাস্থানে দস্যুতস্করের প্রাদুর্ভাব ছিল। তখন মুসলমান রাজত্বের পতন ও ইংরাজ রাজত্বের অভ্যুত্থানের সন্ধি-

কাল, দেশের শাসন-কার্য্য ঘোরতর বিশৃঙ্খল। এই দুঃসময়ে মহসীন আত্মশক্তির উপর বিশেষরূপ নির্ভর করিয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুদূরবর্ত্তী আরব, পারস্য, তুরস্ক, মিশররাজ্য ও নানাদিগ্‌দেশ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

মন্নুজান পিতৃদেবের চরম-আদেশানুসারে মির্জ্জা সলালউদ্দীনের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। মির্জ্জা সলালউদ্দীন ইস্পাহানের এক সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূত ছিলেন। মোতাহার বংশের সহিত ইঁহার পূর্ব্ব হইতে আত্মীয়তা ছিল। সলালউদ্দীন মাসিক পনের শত টাকা বেতনে হুগলীর ফৌজদারের কার্য্য করিতেন। ইনি পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত এবং একজন সুকবি ছিলেন। বিবাহের পর নব-দম্পতী কিছু কাল অসাধারণ বদান্যতা ও আদর্শ-চরিত্রের জন্য হুগলীর সর্ব্বসাধারণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভাজন হইয়া সংসার-সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

যে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে রমণী সংসারে দেবীপদবাচ্যা হন, মন্নু-জানের সেই সকল গুণের কোনটির অভাব ছিল না। তিনি বাল্যা-বধি ভোগ-বিলাসে স্পৃহা-শূন্য ছিলেন, ভ্রাতা মহসীনের সংসর্গে থাকিয়া তিনিও বুঝিয়াছিলেন, দান ব্যতীত অর্থের সদ্‌ব্যবহার আর কিছু-তেই হয় না। দয়াই জগতে সারধর্ম্ম; দীনের দুঃখ-মোচন, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, পীড়িতের শুশ্রূষা, ভীতব্যক্তিকে অভয়দান ইত্যাদি শুভানুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্য-জীবনের পবিত্রতা সম্পাদিত হয়। তিনি এক্ষণে বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, তাঁহার ভাণ্ডার ধনে পরিপূর্ণ; সুতরাং মন্নু-জান এক্ষণে পতির সহিত মিলিত হইয়া সেই সারধর্ম্ম দানকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের কৃপায় দেশবাসী দুঃস্থগণ অনায়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

নিয়তির নির্দেশক্রমে দম্পতীর ভাগ্যে অধিকদিন এ সুখসম্ভোগ ঘটিল না; যে পূর্ণ শশধরের বিমল জ্যোতিতে পৌর্ণমাসী রজনী আনন্দে

হাস্ত করিতেছিল, সেই পূর্ণচন্দ্র সমগ্র জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া, সহসা চির-রাহু গ্রাসে পতিত হইল। যে তরু আশ্রয় করিয়া, স্বর্ণ-কান্তি ব্রততী লোক-লোচনের আনন্দ-বিধান করিতেছিল, সহসা সেই তরু প্রবল ঝটিকা-বেগে উন্মূলিত হইয়া ধরাশায়ী হইল। মির্জ্জা সলালউদ্দীন প্রিয়তমা পত্নীকে শোকান্ধকারে নিমগ্ন ও ধূলি-বিলুণ্ঠিত করিয়া সহসা কাল-গ্রাসে পতিত হইলেন। পতি-বিয়োগ-বিধুরা মন্নুজান বিপুল ধনশালিনী হইয়াও আজ আপনাকে দরিদ্র হইতেও দরিদ্রবোধ করিতে লাগিলেন। নগর-বাসিগণ মন্নুজানের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। শোকের তীব্রতা চিরদিন সমান থাকে না। মন্নুজান কিছুদিন পরে কথঞ্চিৎ শোক সংবরণ করিয়া পুনরায় কর্ত্তব্যকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। মন্নুজান অনেকদিন পর্য্যন্ত সুবন্দোবস্তের সহিত বিষয়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন। প্রজাগণকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। তাঁহার অর্থ-সাহায্যে অনেক পুরাতন মসজিদের জীর্ণ সংস্কার হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সংসারের প্রতি তাঁহার বীতস্পৃহা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময় তাঁহার ইচ্ছা হইল, ভ্রাতা মহসীন যদি ফিরিয়া আসিত, তাহা হইলে তাহার হস্তে সম্পত্তি-রক্ষণ-ভার অর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্তমনে ভগবৎ সেবায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে পারিতাম।

বিধাতা অচিরে তাঁহার এ অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। ইতিমধ্যে মহসীন সন্ন্যাসী বেশে সাতাইশ বৎসরকাল হিন্দুস্থান, আরব, পারস্য, মধ্য এশিয়া, মিশরদেশ প্রভৃতি পরিভ্রমণ করতঃ দেশদেশান্তরের প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকারের সৌন্দর্য্যলীলা অবলোকন পূর্ব্বক নয়ন-মন চরিতার্থ করিয়া, আরব দেশান্তর্গত মোস্লেম সন্তানের চির পূজনীয় চির গৌরবময় পুণ্যবতী মক্কানগরীতে মোস্লেম ধর্ম্মানুযায়ী বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানে

"হাজি" উপাধিলাভ করিয়া খোরাসানের পথে পুনরায় ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। এই সুদীর্ঘ পর্য্যটনে যে তাঁহাকে কত ক্লেশ কত বিপদ সহ্য করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মুসলমান ধর্ম্মের শিক্ষাকেন্দ্র, ধর্ম্মকেন্দ্র, রাজন্যবর্গের রাজধানী ও সমৃদ্ধশালী নগর, খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের সমাধি-ভবন, এ সকল নানাস্থান সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি দ্বারা অবলোকন করতঃ নানা দেশ দেশান্তরের শাসননীতি, শিক্ষানীতি, আচার ব্যবহার ইত্যাদি বিশ্লেষণদ্বারা প্রচুর জ্ঞান-রত্ন লাভ করিয়া মহসীন ধর্ম্মানুশীলনোদ্দেশ্যে মুরশিদাবাদে গমন করিলেন। কিন্তু ভগ্নীর সবিশেষ অনুরোধ বশতঃ অগত্যা তাঁহাকে হুগলী যাত্রা করিতে হইল। দেশে ফিরিয়া আসিলে সকলেই তাঁহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত অভিমণ্ডিত করিয়া লইলেন। তাঁহার খ্যাতি ভারতবর্ষের নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে এইরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল যে তিনি ভারতবর্ষের যখন যে কোন নগরে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেখানেই তাঁহার আদর অভ্যর্থনার্থ আয়োজন হইয়াছে। মহসীনও সর্ব্বত্র তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরল মধুর ব্যবহারদ্বারা এবং জ্ঞানগর্ভ উপদেশবাক্য প্রয়োগে জনসাধারণের মনপ্রাণ মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

মহসীনকে দর্শন করিয়া মন্নুজানের আনন্দের সীমা রহিল না। বহুদিন পরে ভ্রাতা ও ভগ্নী মিলিত হইয়া নীরবে কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। শোকাশ্রুর সহিত আনন্দাশ্রু মিলিত হইল। ভ্রাতা ও ভগ্নী উভয়ের ধর্ম্মপ্রাণতা ও বদান্যতা গুণের সমবায়ে মনিকাঞ্চনের সংযোগ হইল।

মন্নুজানের সন্তানসন্ততি ছিল না। তিনি দানপত্রদ্বারা ভ্রাতাকে স্বীয় সম্পত্তির অধিকারী করিবার পর, জীবনের শেষ সময় সংসারের তীব্র কোলাহল হইতে বিমুক্ত হইয়া, পরম করুণাময় ঈশ্বরের আরাধনায় কায়মনোবাক্যে নিমগ্ন হইলেন। সদাশয় ভ্রাতার গুণে অন্তিম সময়ে তাঁহাকে কোনরূপ উদ্বেগ ভোগ করিতে হয় নাই। মন্নুজান খ্রীঃ ১৮০৩

অব্দে (বঙ্গীয় ১২১০ সালে) ৮৬ বৎসর বয়সে স্বজনবর্গ,বন্ধুবান্ধব ও হুগলীর সাধারণ অধিবাসিগণকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া লোকান্তরিত হইলেন। তদীয় মৃতদেহ তাঁহার পতির কবরের পার্শ্বে সমাহিত হইল। পতিপত্নী একস্থানে চিরবিশ্রাম উপভোগ করিতে লাগিলেন।

এখন মহম্মদ মহসীন ভগ্নীর অতুল সম্পদের একমাত্র অধিকারী হইলেন। এখন ভগ্নীর ত্যক্ত ঐশ্বর্য্য সাধারণের সম্পত্তি বিবেচনা করিয়া তৎসংরক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন, কিন্তু তাঁহার মানসিক অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি পূর্ব্ববৎ বিষয়ে অনাসক্ত ও ভোগবিলাসে বীতস্পৃহ সন্ন্যাসী রহিলেন; সাধারণ ধনগর্ব্বিত আড়ম্বরপ্রিয় অতৃপ্ত-বিষয়-কামনাপরতন্ত্র বিলাসীর ন্যায় সর্ব্বদা আত্মসুখে ও বিলাস-তরঙ্গে ভাসমান না হইয়া নিরন্তর ধর্ম্মজীবনে অনুপ্রাণিত ও নিঃস্বার্থ-পরহিত-ব্রতে ব্রতী হইয়া পরকীয়-দারিদ্র্য-দুঃখ বিমোচনে বিমল আত্মপ্রসাদ ও অতুল ঐশ্বর্য্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অন্নহীনকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান ও অর্থহীনকে অর্থদান, তাঁহার জীবনের নিত্যব্রত হইল। নিশাকালে ছদ্মবেশে নগরের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া নিঃস্বগণকে সংগোপনে অর্থদান ও দুঃস্থের দুর্দ্দশা মোচন করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতেন। একদা নৈশভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিশীথে নগরপ্রান্তে একখানি পর্ণকুটীর হইতে কতিপয় শিশুকণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ শ্রবণে অনুসন্ধিৎসা-বশতঃ তথায় উপনীত হইয়া কুটীর গবাক্ষ হইতে দেখিলেন, একটী দুঃস্থ পরিবার সমস্ত দিবস অনশনে প্রপীড়িত; শিশুগুলি জঠরজ্বালায় অধীর হইয়া রোদন করিতেছে; জনকজননী শুষ্কমুখে নিষ্প্রভ-শূন্য-নয়নে অবিরবিগলিতধারে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। দান-বীরের হৃদয় অনুকম্পায় দ্রবীভূত হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ গবাক্ষ দিয়া কতকগুলি মুদ্রা গৃহমধ্যে অলক্ষিতভাবে নিক্ষেপ করিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাঁহার

প্রকাশ্য বদান্যতা এরূপ মহীয়সী যে তিনি কখন দানার্থীকে প্রত্যাখ্যান করিতেন না বরং অযাচিতভাবে পাত্রবিশেষে মুক্তহস্তে দান করিতেন।

মহসীন ভৃত্য ও অনুচরবর্গের প্রতিও যারপরনাই সদয় ব্যবহার করিতেন। একদা তাঁহার এক ভৃত্য ভগ্নীর সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ জানাইয়া বিদায় প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাকে গৃহে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন এবং গমনকালে তাহার হস্তে একটী পুলিন্দা প্রদান করিয়া বলিলেন "তোমার ভগ্নীর জন্য ইহার মধ্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ আছে।" ভৃত্য গৃহে গমন করিয়া যখন ঐ পুলিন্দাটী উন্মোচন করিয়া উহার অভ্যন্তরে ঔষধের সহিত রৌপ্য মুদ্রাগুলি দর্শন করিল তখন তাহার হৃদয় কি অনির্ব্বচনীয় ভাবে পূর্ণ হইল! ধন্য দয়ারসাগর নিঃস্বার্থ মুক্তহস্ত দান-বীর মহম্মদ মহসীন! একমাত্র দয়ার বলেই তুমি অমরখ্যাতি লাভ করিয়া হিন্দু মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সকলেরই হৃদয়-পটে অঙ্কিত হইয়াছ!

মহম্মদ মহসীনের এইরূপ ব্যক্তিগত দান যে কত ছিল, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। সাহায্যপ্রার্থী প্রকৃত দরিদ্র এবং সাহায্যোপযোগী কিনা কেবল এইটুকু বিবেচনা করিয়াই দান করিতেন। তাঁহার কোন নিকট আত্মীয় ছিলেন না। তাঁহার বিপুল সম্পত্তি মৃত্যুর পর ব্যক্তিবিশেষের ভোগবিলাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। যাহাতে দীনদরিদ্র নরনারীর কল্যাণ সাধিত হয়, তন্নিমিত্ত সমুদয় সম্পত্তি উৎসর্গীকৃত করাই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন।

উদার-হৃদয় মহসীন মৃত্যুর পূর্ব্বে খৃঃ ১৮০৬ অব্দের ৯ই জুন (বঙ্গীয় ১২১৩ সালের ১৯শে বৈশাখ) একখানি দানপত্র লিখিয়া আপনার সমস্ত সম্পত্তি লোক-হিতকর অনুষ্ঠানের জন্য উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্পত্তির বাৎসরিক আয় প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। দানপত্রের মর্ম্মানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল।

আমি—হাজি মহম্মদ মহসীন, হাজি ফয়জুল্লার পুত্র আগা ফয়জুল্লার পৌত্র, নিবাস হুগলী। আমি স্বজ্ঞানে স্বইচ্ছায় ও সুস্থশরীরে এই দান পত্র সম্পাদন পূর্ব্বক এই বিধান করিতেছি যে, যশোহরের অধীন পরগণা সৈদপুর ও শোভনাল, আমার জমিদারীভুক্ত, হুগলী নগরের ইমামবাড়া নামক বাটি, হাট, ইমামবাজার ও ইমামবাড়া সংলগ্ন সমস্ত সম্পত্তি আমার। আমি উত্তরাধিকারী সূত্রে এই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী। আমার কোন উত্তরাধিকারী নাই। আমার যাবতীয় সম্পত্তি আমি ধর্ম্মোদ্দেশে বিনিয়োগ করিতেছি। আমার লিখিত বিধান অনুসারে আমার দ্বারা আচরিত সমুদয় দানকার্য্য চিরকাল চলিতে থাকিবে। আমার প্রিয় সুহৃদ্ রাজবআলি খাঁ ও সাকের আলি খাঁকে আমি মাতোয়ালি বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিলাম। ইহারা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিয়া অবশিষ্ট টাকা নিম্নলিখিতরূপ নয় অংশে বিভক্ত করিয়া কার্য্য চালাইবেন। তিন অংশ ফতেয়া, মহরম ইত্যাদি পর্ব্বোপলক্ষে এবং ইমামবাড়া ও মসজিদের সংস্কার কার্য্যে। দুই অংশ মাতোয়ালি-গণের পারিশ্রমিক জন্য; এবং অবশিষ্ট চারি অংশ কর্ম্মচারিগণের বেতন ও আমার স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা অনুসারে মাসিক বৃত্তিদানে ও দৈনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ব্যয় হইবে। কোন মাতোয়ালি কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম হইলে তিনি অপর কোন যোগ্য ব্যক্তিকে আপনার স্থলবর্ত্তী করিয়া লইতে পারিবেন। ইহা আমার চরম দানপত্ররূপে গণ্য হইবে। আবশ্যক হইলে বিচারালয়ে ইহা আমার ন্যায়ানুমোদিত কার্য্যের যথার্থতা সপ্রমাণ করিবে।

বিশ্বমানবের কল্যাণমন্দিরে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি দান করিয়া মহাত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রাণে শান্তি আসিল। দানবীর দান-যজ্ঞ সম্পাদনের পর মাত্র সাত বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। জীবনের এই শেষ সময়েও দেশহিতকর নানাবিধ সৎকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। পরিশেষে খ্রীঃ ১৮১২

অব্দের ২৯শে নভেম্বর (বঙ্গীয় ১২১৯ সালের ১৬ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতি-বার) ৮০ বৎসর বয়সে এই নিঃস্বার্থ দানব্রতপরায়ণ দান-বীরের পবিত্র আত্মা নশ্বর মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেল। কর্ম্মবীর কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। কর্ম্মবীরের ধর্ম্মানুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হইল। মহসীনের মৃত্যুসংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি নির্ধন, সকলেরই অন্তঃকরণ তাঁহার মৃত্যুতে ব্যথিত হইল। ধনী, নির্ধন, হিন্দু, মুসলমান নীরবে শোকাশ্রুবর্ষণে ভক্তিভাবে সমাধিক্ষেত্র পর্য্যন্ত তাঁহার পবিত্র শব-দেহের অনুগমন করিলেন। ইমামবাড়ার নিকটবর্ত্তী সমাধিস্থলে শব নীত হইলে তাঁহার নশ্বর-দেহ যথানিয়মে সমাহিত হইলে বিষণ্ণ জনস্রোত শোকাশ্রুবর্ষণে নীরবে প্রত্যাগমন করিল।

মহাত্মা মহসীনের নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহের ধ্বংস হইল, কিন্তু তিনি যে ত্যাগ ও দানের অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহা কি কোন দিন কোন কালে ধ্বংস হইবে? চিরকাল শত শত মোস্লেম ও হিন্দু সন্তান তাঁহার গৌরবময় নাম উচ্চারণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিবে। এমন দান এমন মহত্ত্ব কয়জনে দেখাইতে পারিয়াছেন? এমন আত্মত্যাগ কয়জনে করিতে পারেন? কয়জনে বিশ্ব-জনীন পবিত্র প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নির্ধনের জন্য, দুঃখী দরিদ্রের নিমিত্ত আপনা ভুলিয়া সর্ব্বস্ব দান করিতে পারেন? এমন ত্যাগী মহাত্মা কর্ম্মবীর পৃথিবীতে কয়জন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? মহসীনের দেহ মাটিতে মিশিয়াছে, কিন্তু তাঁহার চিরপবিত্র চিরমধুর নাম আকাশে বাতাসে মানবের হৃদয়াকাশে এমনি মিশিয়া গিয়াছে যে তাহার আর মরণ নাই—অক্ষয় অব্যয় অমর।

ইমামবাড়ার অনতিদূরে গঙ্গার তীরে সমাধি-উদ্যান। স্থানটী প্রশান্ত ও গম্ভীর। উদ্যানের পার্শ্ব দিয়া পুণ্যসলিলা ভাগীরথী কলনাদে

মহসীনের কীর্ত্তি-গাঁথা গাহিয়া গাহিয়া সাগরাভিমুখে চলিয়াছেন। প্রতি তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে যেন মাতা জাহ্নবী পুণ্যবাণের পুণ্যগাঁথা গাহিতে উৎসুক।

হাজি মহম্মদ মহসীনের মৃত্যুর পর—রাজাব আলি খাঁ ও সাকের আলি খাঁ দানপত্রের বিধানানুসারে কর্ম্ম ও সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। একান্ত দুঃখের বিষয় এই যে কিছুকাল পরে যাবতীয় কার্য্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া গোলযোগের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। হুগলীর অধিবাসিগণ এই সকল গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দর্শনে মৃত মহাত্মার সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট নানাদিক চিন্তা করিয়া খ্রীঃ ১৮১০ অব্দে সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিলেন এবং খ্রীঃ ১৮১৫ অব্দের ৬ই সেপ্টেম্বরের আদেশমত কলিকাতা বোর্ড অব রেভিনিউ যশোহর ও হুগলীর কালেক্টরের কর্তৃত্বাধীনে সৈয়দ আকবর আলি খাঁ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সম্পত্তির পরিদর্শক নিযুক্ত করিলেন। অনুসন্ধানে কতকগুলি বিশৃঙ্খলা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। রাজাব আলি খাঁ ও সাকের আলি খাঁ একরূপ অপসৃত অবস্থায় থাকিলেন; খ্রীঃ ১৮১৮ অব্দে তাঁহারা পদচ্যুত হইলেন এবং গবর্ণমেণ্ট সৈয়দ আকবর আলি খাঁকে মাতোয়ালি (তত্ত্বাবধায়ক) নিযুক্ত করিলেন। পদচ্যুত মাতোয়ালিদ্বয় গবর্ণমেণ্ট বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। এখানকার আদালতের বিচারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল না—ইংলণ্ড পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। এইরূপে সতের বৎসর পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চলিয়া ইংলণ্ডের প্রিভি-কাউন্সিলে খ্রীঃ ১৮৩৫ অব্দে তাহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও বন্দোবস্ত করিবার ভার পাইলেন।

এই সুদীর্ঘ সময়ে সম্পত্তির আয় হইতে সমস্ত ব্যয় বাদে তহবিলে প্রায়

নয় লক্ষ টাকা (৮,৬১১০০) সঞ্চিত হইয়াছিল। এই সঞ্চিত অর্থ হইতেই হুগলী কলেজ ও ইমামবাড়ার বিশাল অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। তদানীন্তন গবর্ণর জেনারল সার চার্লস্ মেটকাফ্ মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুসারে খৃঃ১৮৩৬ অব্দে ১লা আগষ্ট হুগলী কলেজ স্থাপিত হয়।* এই কলেজে প্রথম হইতেই জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সর্ব্বশ্রেণীর ছাত্রগণকে গ্রহণ করা হয়। সাইত্রিশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত হুগলী কলেজ মহসীন-ফণ্ডের অর্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। পরে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা অল্প হওয়ায় হুগলী কলেজ পরিচালনের জন্য মহসীন-ফণ্ড হইতে অর্থ গ্রহণ সঙ্গত বিবেচিত হইল না। গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং উক্ত কলেজের সর্ব্ববিধ ব্যয়ভার বহন করিতে আরম্ভ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট উক্ত কলেজের ব্যয়ভার গ্রহণ করিবার পর হইতে মহসীন-ফণ্ডের সে উদ্বৃত্ত অর্থ অর্থাৎ কলেজের উদ্দেশে যে অর্থ নির্দ্দিষ্ট ছিল তদ্দারা হুগলী, ঢাকা ও রাজসাহীর আরবি পাঠশালা (মাদ্রাসা) ও তৎসংলগ্ন ছাত্রনিবাস স্থাপিত এবং কতকগুলি ছাত্রবৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছে।

আগামোতাহার হুগলীতে ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু তাহার বিশেষ কোন উন্নতি করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর মির্জ্জা সলালউদ্দীন তাহার কতকটা উন্নতি করিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তাহার প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধির অনেক বাকী ছিল। মহসীনের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, সেই ইমামবাড়া এরূপ করিবেন যেন উহা বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে আদর্শস্বরূপ হইয়া উঠে। কিন্তু তিনি জীবিতকালে সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল লর্ড অকলণ্ডের মতানুসারে খৃঃ ১৮৪৮ অব্দের

---

* কলেজ গৃহের ভিত্তি-প্রস্তরে নিম্নলিখিত স্মারক-লিপি খোদিত আছে,—

College of Mohamed Mohasin. This College was established through the munificence of the late Mohamed Mohasin and was oppened in 1st of August 1836.

২৮শে জুলাই ইমামবাড়ার পুনঃ নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। বহু অর্থব্যয়ে (২১৭,৪১৮ টাকা) খৃঃ ১৮৬১ অব্দে এই অট্টালিকার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়। প্রায় বার হাজার টাকা মূল্যের একটী বৃহৎ ঘড়ী উহার উচ্চ চূড়ায় স্থাপিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান ইমামবাড়ার ন্যায় সুদৃশ্য অট্টালিকা বঙ্গদেশে অতি অল্পই আছে। ইমামবাড়া মহাত্মা মহসীনের ধর্ম্ম-জীবনের কীর্ত্তির অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন।

ইমামবাড়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। উহার সম্মুখে রাজ-পথ, পশ্চাতে হুগলী নদী। দুইটী উচ্চ চূড়া অট্টালিকার সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। সিংহ-দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেই সম্মুখে বিরাট প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণ মধ্যে সুবৃহৎ জলাধার, সময়ে সময়ে কৃত্রিম উৎস হইতে জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিয়া থাকে। প্রাঙ্গণের তিন দিকে দ্বিতল অট্টালিকা। পুরোভাগে নানা কারুকার্য্য খচিত উপাসনা-গৃহ, উপাসনা-গৃহের প্রাচীরে কোরানের শ্লোকসমূহ এবং মহসীনের দানপত্রখানি অতি সুন্দর ভাবে খোদিত রহিয়াছে। উপাসনা-গৃহের এক পার্শ্বে অনুচ্চ-বেদী; বেদীর বামে, দক্ষিণে ও সম্মুখে মর্ম্মরস্তরে প্রকোষ্ঠের এক মনোহর শোভা হইয়াছে। অসংখ্য দীপাধারে গৃহ সুসজ্জিত। উপা-সনা-গৃহে যখন সহস্র উপাসক সমতানে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে থাকেন, তখন মনে এক অপূর্ব্বভাবের উদয় হয়। খৃঃ ১৮৩৬ অব্দে ইমামবাড়ার দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। তথায় সুদক্ষ চিকিৎসকগণ সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া সমাগত রোগীদিগের চিকিৎসা করেন। এখান হইতে দীন দরিদ্র রোগীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরিত করা হয়। অতিথিশালার দ্বার আগন্তুকগণের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত; এখানে শত শত লোক নিত্য আহার করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক মুসলমান পর্ব্বোপলক্ষে অভ্যাগত মুসলমানগণ উপাদেয় আহারে তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন, এবং প্রচুর অর্থ দীন দরিদ্রদিগকে বিতরিত করা হয়। এইরূপে মহাত্মা মহসীনের দানের ফলে কত দিকে, কত বিষয়ে, কত প্রকারে যে নিয়ত প্রভূত উপকার সাধিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

মুসলমানদিগের বিদ্যাচর্চ্চার উন্নতিকল্পে এবং নানাবিধ উচ্চশিক্ষা প্রচারের জন্য মহসীন-ফণ্ডের অর্থ হইতে বার্ষিক ছাপ্পান্ন সহস্র

টাকা (৫৬০০০৲) ব্যয়ের জন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। তদ্দ্বারা চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজসাহী, হুগলী ও জোরাঘাটা মাদ্রাসার ব্যয়ভার এবং হুগলী মুসলমান-ছাত্রাবাসের ব্যয় প্রদত্ত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট স্কুল, কলেজ প্রভৃতি বিদ্যালয়ের জন্ত মহম্মদ মহসীনের সাহায্য নির্দ্দিষ্ট আছে। এতদ্দ্বারা দরিদ্র মুসলমান ছাত্রগণের আংশিক শিক্ষা-ব্যয় প্রদত্ত হয়। এতদ্ভিন্ন মেধাবী মুসলমান ছাত্রগণকে শিক্ষা-কল্পে উৎসাহ প্রদানার্থ "মহসীন-বৃত্তি" প্রদত্ত হইয়া থাকে।

খৃঃ ১৮৬৩ অব্দে দেবোত্তর আইন প্রচলিত হইলে গবর্ণমেণ্ট এক কমিটি গঠন করিয়া, উক্ত কমিটির হস্তে সম্পত্তির ⅓ অংশের আয় অর্পণ করিয়া ইমামবাড়া সংক্রান্ত যাবতীয় ধর্ম্মকার্য্য তত্ত্বাবধানের ভার দিয়াছেন।

হাজি মহম্মদ মহসীনের সদাশয়তা ও পরোপকারিতা জাতি ও সমাজ বিশেষে আবদ্ধ থাকিত না। তিনি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকে ভাল বাসিতেন, সে ভালবাসার নিকট হিন্দু-মুসলমান ইতর বিশেষ ছিল না। যাহাতে পরস্পরের মধ্যে একতা ও সৌহার্দ্দ জন্মে এবং উভয় সম্প্রদায় যাহাতে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে, তাঁহার সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ ও যত্ন ছিল।

তাঁহার প্রগাঢ় মানব-প্রেম মনুষ্য মাত্রের দুঃখ ও দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য যেরূপ ব্যাকুল হইত, সেইরূপ মানসিক উৎকর্ষসাধনের জন্য চেষ্টা করিত। তিনি সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, দেশের লোক যতই উচ্চ শিক্ষালাভ করিতে পারিবে, ততই তাহাদের নিজের জীবনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সমাজের এবং দেশের উন্নতিসাধন করিতে পারিবে। জীবিতাবস্থায় মহম্মদ মহসীন হিন্দু ও মুসলমান বালকগণের শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় অর্থে হুগলী "ইমামবাড়া স্কুল" প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে খৃঃ ১৮[illegible] অব্দে মহসীনের অর্থে প্রসিদ্ধ হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উক্ত স্কুল তৎসঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছে।

মহাত্মা হাজি মহম্মদ মহসীনের [illegible] অতি [illegible] ও পবিত্রভাবে

পরিপূর্ণ। অপরিসীম দয়া ও প্রগাঢ় সাধুতা তাঁহার পবিত্র জীবনকে প্রতিভাসিত হইয়াছে। তিনি পরের উপকারের জন্য জন্মিয়াছিলেন এবং পরের উপকার করিয়া আপনার জীবন সার্থক করিয়াছিলেন। আপনার সুখ সমৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি ছিল না, পর-সুখে তাঁহার সুখ ও পর-দুঃখে তাঁহার দুঃখ হইত। তাঁহার কার্য্যে পবিত্র দেব-ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কিছুমাত্র বিলাস-প্রিয়তা ছিল না, সামান্য অশন-বসনেই তিনি পরিতৃপ্ত থাকিতেন; আপনার সুখ-সমৃদ্ধির দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তিনি নিরামিষ আহার করিতেন এবং সর্ব্বদা শুদ্ধাচারে থাকিতেন। পারস্য ভাষায় তিনি সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি কবিতা হুগলী ইমামবাড়ায় বহুদিবস পর্য্যন্ত রক্ষিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে সেগুলি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি ইতিহাস, শিক্ষা ও বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনায় অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন, এবং লৌহের কার্য্যে ও সূচি-কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন।

মহম্মদ মহসীন আরবদেশে অবস্থিতি করিয়া আরবি সাহিত্যে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। তিনি অতি যত্নে কোরাণ লিখিয়া অনেক সময়ে দরিদ্র মুসলমানদিগকে দান করিতেন।

হাজি মহম্মদ মহসীন ইন্দ্রিয়জয়ী মহাপুরুষ, চিরকৌমার-ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি রাজর্ষি জনকের ন্যায় বিপুল বিভবশালী হইয়াও আত্মসংযম ও ত্যাগ-স্বীকারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার বিপুল বিভব স্বজাতির বিদ্যা-শিক্ষা, ধর্ম্মোন্নতি এবং জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে পর-হিতার্থে বিনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার এই মহীয়সী দানশীলতা ও [illegible]অনুষ্ঠান জন্যই আজ তিনি প্রাতঃস্মরণীয়।

সম্পূর্ণ।

প্রিন্টার—শ্রীকুলচন্দ্র দে,
[illegible] প্রেস, [illegible] ছিদামমুদির লেন, কলিকাতা।